থাকে—কেননা ভয়ের কারণে তাহার সাহস হয় না। কিন্তু যখনই সে নামাযকে নষ্ট করিয়া দেয় তখন শয়তানের সাহস অনেক বাড়িয়া যায় এবং তাহার মধ্যে ঐ ব্যক্তিকে গোমরাহ করার আকাঙ্ক্ষা পয়দা হইয়া যায়। অতঃপর শয়তান ঐ ব্যক্তিকে বহু ধ্বংসাত্মক কাজে এবং বড় বড় গোনাহে লিপ্ত করিয়া দেয়। (মোন্তাখাবে কান্‌য্‌) বস্তুতঃ ইহাই আল্লাহ তায়ালার এই এরশাদের উদ্দেশ্য ঃ

إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ

অর্থাৎ, 'নিশ্চয়ই নামায নির্লজ্জতা ও অশ্লীল কাজ হইতে ফিরাইয়া রাখে।' ইহার বর্ণনা শীঘ্রই আসিতেছে।

(৫) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِىْ يَسْرِقُ صَلٰوتَهٗ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ يَسْرِقُ صَلٰوتَهٗ قَالَ لَا يُتِمُّ رُكُوْعَهَا وَلَا سُجُوْدَهَا.

نبئ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بدترین چوری کرنے والا شخص وہ ہے جو نماز میں سے بھی چوری کرلے. صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ نماز میں سے کسطرح چوری کرے گا. ارشاد فرمایا کہ اس کا رکوع اور سجدہ اچھی طرح سے نہ کرے .

(رواہ الدارمی وفی الترغیب رواہ احمد والطبرانی وابن خزیمۃ فی صحیحہ وقال صحیح الاسناد اھ وفی المقاصد الحسنۃ حدیث ان اسوء الناس سرقۃ رواہ احمد والدارمی فی مسندیھما من حدیث الولید بن مسلم عن الاوزاعی عن یحیٰی بن ابی کثیر عن عبد اللہ بن ابی قتادۃ عن ابیہ مرفوعا وفی لفظ بحذف ان وصححہ ابن خزیمۃ والحاکم وقال انہ علی شرطھما ولم یخرجاہ لروایۃ کاتب الاوزاعی لہ عنہ عنہ عن یحیٰی عن ابی سلمۃ عن ابی ھریرۃ ورواہ احمد ایضا و الطیالسی فی مسندیھما من حدیث علی بن زید عن سعید بن المسیب عن ابی سعید الخدری بہ مرفوعا وروایۃ ابی ھریرۃ عند ابن منیع وفی الباب عن عبد اللہ بن مغفل وعن النعمان بن مرۃ عند مالک مرسلا فی اخرین اھ وقال المنذری فی الترغیب لحدیث ابن مغفل رواہ الطبرانی فی معاجمہ الثلثۃ باسناد جید وقال لحدیث ابی ھریرۃ رواہ الطبرانی فی الاوسط وابن حبان فی صحیحہ والحاکم وقال صحیح الاسناد قلت وحدیث ابی قتادۃ وابی سعید ذکرھما السیوطی فی الجامع الصغیر ورقم بالصحیح)

(৫) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, সবচাইতে নিকৃষ্ট চোর হইল ঐ ব্যক্তি, যে নামাযের মধ্যেও চুরি করে। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নামাযের মধ্যে কিভাবে চুরি করিবে? এরশাদ ফরমাইলেন, অর্থাৎ উহার রুকু–সেজদা ঠিকমত আদায় করে না।(দারিমী, তারগীব ঃ আহমদ, তাবারানী)

ফায়দা ঃ এই বিষয়টি কয়েকটি হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমতঃ চুরি কাজটাই চরম ঘৃণার কাজ, চোরকে সকলেই ঘৃণার চোখে দেখে। আবার চুরির মধ্যেও নামাযে রুকু–সেজদা ঠিকমত আদায় না করাকে নিকৃষ্টতম চুরি বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) বলেন, একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, এখন দুনিয়া হইতে এলেম উঠিয়া যাওয়ার সময় হইয়াছে। সাহাবী হযরত যিয়াদ (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এলেম দুনিয়া হইতে কিভাবে উঠিয়া যাইবে, আমরা তো কুরআন পড়িতেছি এবং নিজেদের সন্তানদেরকে কুরআন পড়াইতেছি (তাহারা আবার নিজেদের সন্তানদেরকে পড়াইবে—এইভাবে ক্রমাগত চলিতে থাকিবে)। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, আমি তো তোমাকে বড় বুদ্ধিমান মনে করিতাম, খৃষ্টান ও ইহুদীরাও তো তৌরাত এবং ইঞ্জীল পড়ে ও পড়ায়, কিন্তু ইহা তাহাদের কি কাজে আসিয়াছে। আবু দারদা (রাযিঃ)এর এক শাগরেদ বলেন, আমি অন্য একজন সাহাবী হযরত আবু উবাদা (রাযিঃ)এর নিকট এই ঘটনা বর্ণনা করিলাম। তিনি বলিলেন, আবু দারদা সত্য বলিয়াছেন। আমি কি তোমাকে বলিব সর্বপ্রথম দুনিয়া হইতে কোন্‌ জিনিস উঠিয়া যাইবে? সর্বপ্রথম নামাযের খুশু উঠিয়া যাইবে। তুমি মসজিদ ভরা লোকদের মধ্যে একজনকেও খুশুর সহিত নামায পড়িতে দেখিবে না। হযরত হোযাইফা (রাযিঃ) যাহাকে হুযূর (সাঃ)এর রহস্যবিদ বলা হয়, তিনিও বলেন যে, সর্বপ্রথম নামাযের খুশু উঠাইয়া লওয়া হইবে। অপর এক হাদীসে আসিয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালা ঐ নামাযের প্রতি ভ্রূক্ষেপই করেন না যাহাতে রুকু–সেজদা সুন্দরভাবে করা হয় না। এক হাদীসে আছে, মানুষ ষাট বৎসর যাবৎ নামায পড়ে তবু তাহার একটি নামাযও কবুল হয় না। কেননা কখনও রুকু ঠিকমত করিল তো সেজদা ঠিকমত করিল না কিংবা কখনও সেজদা ঠিকমত করিল তো রুকু ঠিকমত করিল না।

হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহঃ) তাঁহার 'মাকতুবাতে' নামাযের উপর খুবই জোর দিয়াছেন। তিনি অনেকগুলি পত্রে নামাযের বিভিন্ন

বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। এক পত্রে তিনি লিখিয়াছেন, সেজদায় হাতের অঙ্গুলি মিলাইয়া রাখা এবং রুকুর মধ্যে পৃথক রাখার প্রতি গুরুত্ব দেওয়াও জরুরী। কারণ, অঙ্গুলি মিলাইয়া রাখা ও পৃথক রাখার হুকুম শরীয়তে অযথা দেওয়া হয় নাই। অর্থাৎ সাধারণ আদবের প্রতিও লক্ষ্য রাখা জরুরী। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও লিখিয়াছেন, নামাযে দাঁড়ান অবস্থায় সেজদার স্থানে দৃষ্টি রাখা, রুকু অবস্থায় পায়ের উপর, সেজদা অবস্থায় নাকের উপর এবং বসা অবস্থায় হাতের উপর দৃষ্টি রাখা নামাযের মধ্যে খুশু পয়দা করে এবং উহার দ্বারা নামাযে একাগ্রতা হাসিল হয়। এইসব সাধারণ আদব ও মুস্তাহাবের উপর আমল করিলে যদি এত বড় উপকার হয়, তবে বড় বড় আদব ও সুন্নতের উপর আমল করিলে যে কত বড় উপকার হইবে, তাহা তুমিই বুঝিয়া দেখ।

(٦) عَنْ اُمِّ رُوْمَانَ وَالِدَةِ عَائِشَةَ قَالَتْ رَآنِىْ اَبُوْبَكْرِ نِ الصِّدِّيْقُ اَتَمَيَّلُ فِىْ صَلٰوتِىْ فَزَجَرَنِىْ زَجْرَةً كِدْتُّ اَنْصَرِفُ مِنْ صَلٰوتِىْ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ فِى الصَّلٰوةِ فَلْيُسْكِنْ اَطْرَافَهٗ لَا يَتَمَيَّلُ تَمَيُّلَ الْيَهُوْدِ فَاِنَّ سُكُوْنَ الْاَطْرَافِ فِى الصَّلٰوةِ مِنْ تَمَامِ الصَّلٰوةِ۔

حضرت عائشہؓ کی والدہ اُمِّ رُومانؓ فرماتی ہیں کہ میں ایکمرتبہ نماز پڑھ رہی تھی نماز میں اِدھر اُدھر جھکنے لگی حضرت ابوبکر صدیقؓ نے دیکھ لیا تو مجھے اس زور سے ڈانٹا کہ میں (ڈر کی وجہ سے) نماز توڑنے کے قریب ہوگئی پھر ارشاد فرمایا کہ میں نے حضورؐ سے سُنا ہے کہ جب کوئی شخص نماز میں کھڑا ہو تو اپنے تمام بدن کو بالکل سکون سے رکھے، یہود کی طرح ہلے نہیں، بدن کے تمام اَعضاء کا نماز میں بالکل سکون سے رہنا نماز کے پورا ہونیکا جزو ہے۔

(اخرجه الحكيم الترمذى من طريق القاسم بن محمد عن اسماء بنت ابى بكر عن اُمّ رومان كذا فى الدر وعزاه السيوطى فى الجامع الصغير الى ابى نعيم فى الحلية وابن عدى فى الكامل ورقم له بالضعف وذكر ايضاً برواية ابن عساكر عن ابى بكرؓ من تمام الصلوٰة سكون الاطراف)

(৬) হযরত আয়েশা (রাযিঃ)এর মাতা উম্মে রোমান (রাযিঃ) বলেন, আমি একবার নামায পড়িতেছিলাম এবং নামাযের মধ্যে এদিক–সেদিক ঝুঁকিতেছিলাম। ইহা দেখিয়া হযরত আবু বকর (রাযিঃ) আমাকে এমন জোরে ধমক দিলেন যে, ভয়ে আমি নামায ছাড়িয়া দেওয়ার উপক্রম হইলাম। অতঃপর তিনি বলিলেন, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শুনিয়াছি, যখন কোন ব্যক্তি নামাযে দাঁড়ায়, সে যেন

সমস্ত শরীরকে সম্পূর্ণভাবে স্থির রাখে ; ইহুদীদের মত হেলিয়া দুলিয়া নামায না পড়ে। কেননা, শরীরের সমস্ত অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ স্থির রাখা নামায পরিপূর্ণ হওয়ার অংশ। (দুররে মানসূর ঃ হাকিম–তিরমিযী)

ফায়দা ঃ নামাযের মধ্যে স্থির থাকার তাকিদ সম্পর্কে বহু হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। ওহী বহনকারী ফেরেশতার অপেক্ষায় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ সময় আকাশের দিকে তাকাইতেন। কোন জিনিসের অপেক্ষায় থাকিলে সেদিকে চোখ লাগিয়াই থাকে ; এইজন্য কখনও নামাযের মধ্যেও নজর উপরে উঠিয়া যাইত। পরবর্তীতে যখন قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلٰوتِهِمْ خٰشِعُوْنَ (সূরা মমিনূন, আয়াত ১–২ঃ) আয়াত নাযিল হইল তখন হইতে তাঁহার দৃষ্টি নীচের দিকে থাকিত।

সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) সম্পর্কেও বর্ণিত হইয়াছে যে, প্রথম প্রথম তাঁহারাও এদিক সেদিক দেখিতেন। উক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পর তাঁহারা আর কোনদিকে দেখিতেন না। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) এই আয়াত প্রসঙ্গে বলেন, সাহাবায়ে কেরাম যখন নামাযে দাঁড়াইতেন, তখন তাঁহারা অন্য কোন দিকে নজর করিতেন না ; আপাদমস্তক নামাযের প্রতিই মনোযোগী হইয়া থাকিতেন। নিজেদের দৃষ্টিকে সেজদার জায়গায় রাখিতেন এবং ইহা মনে করিতেন যে, আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে দেখিতেছেন।

হযরত আলী (রাযিঃ)কে কেহ জিজ্ঞাসা করিল, খুশু কি জিনিস? তিনি বলিলেন, খুশু অন্তরে থাকে (অর্থাৎ অন্তর দ্বারা নামাযে মনোযোগী হওয়ার নামই খুশু) এবং অন্য কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করাও খুশুর মধ্যে শামিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, প্রকৃত খুশু করনেওয়ালা তাঁহারাই যাহারা আল্লাহকে ভয় করে এবং নামাযে স্থির থাকে। হযরত আবু বকর (রাযিঃ) বলেন, একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, নেফাকের খুশু হইতে তোমরা আল্লাহ তায়ালার পানাহ চাও। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নেফাকের খুশু কি, এরশাদ করিলেন, বাহিরে স্থির শান্তভাব অথচ অন্তরে মুনাফেকী।

হযরত আবু দারদা (রাযিঃ)ও অনুরূপ একটি ঘটনা বর্ণনা করেন, যাহাতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই এরশাদ বর্ণনা করিয়াছেন যে, নেফাকের খুশু হইল, বাহিরে খুব মনোযোগী বলিয়া মনে হয় কিন্তু অন্তরে কোন মনোযোগ নাই। হযরত কাতাদাহ (রাযিঃ) বলেন,

আল্লাহর ভয় এবং দৃষ্টি নীচের দিকে রাখার নামই হইল অন্তরের খুশু।

একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে নামাযের মধ্যে দাড়িতে হাত বুলাইতে দেখিয়া বলিলেন, যদি এই লোকের অন্তরে খুশু থাকিত তবে সমস্ত অঙ্গ স্থির থাকিত। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, নামাযে এদিক সেদিক তাকানো কেমন? তিনি উত্তর করিলেন, ইহা হইল নামাযের মধ্য হইতে শয়তানের ছোঁ মারিয়া নেওয়া। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার এরশাদ ফরমাইলেন, যাহারা নামাযের ভিতর উপরের দিকে দেখে তাহারা যেন এই কাজ হইতে বিরত থাকে, নতুবা তাহাদের দৃষ্টি উপরেই থাকিয়া যাইবে। (দুররে মানসূর) অনেক সাহাবী ও তাবেয়ী হইতে বর্ণিত আছে, শান্ত থাকার নামই খুশু। অর্থাৎ অত্যন্ত শান্ত ও স্থিরভাবে নামায পড়া চাই।

বিভিন্ন হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই এরশাদ বর্ণিত হইয়াছে যে, তোমরা নামায এমনভাবে পড় যেন ইহাই তোমার আখেরী নামায, ঐ ব্যক্তির মত নামায পড় যে মনে করে যে, এই নামাযের পর আমার আর নামায পড়ার সুযোগই হইবে না। (জামে সগীর)

(৭) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۤءِ وَالْمُنْكَرِ فَقَالَ مَنْ لَّمْ تَنْهَهٗ صَلٰوتُهٗ عَنِ الْفَحْشَاۤءِ وَالْمُنْكَرِ فَلَا صَلٰوةَ لَهٗ۔ (اخرجہ ابن ابی حاتم وابن مردویہ کذا فی الدر المنثور)

حضور اقدس صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم سے کسی نے حق تعالیٰ شانُہٗ کے ارشاد اِنَّ الصَّلٰوۃَ تَنْھٰی الخ (بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور ناشائستہ حرکتوں سے) کے مُتعلّق دریافت کیا تو حضورؐ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی نماز ایسی نہ ہو اور اس کو بے حیائی اور ناشائستہ حرکتوں سے نہ روکے وہ نماز ہی نہیں۔

(৭) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক ব্যক্তি এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল ঃ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى অর্থাৎ, 'নিশ্চয়ই নামায যাবতীয় ফাহেশা ও অন্যায় কাজ হইতে ফিরাইয়া রাখে।'

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যে ব্যক্তির নামায এইরূপ না হয় এবং তাহাকে ফাহেশা ও অন্যায় কাজ হইতে ফিরাইয়া রাখে না উহা নামাযই নহে। (দুররে মানসূর ঃ ইবনে আবি হাতেম)

ফায়দা ঃ নিঃসন্দেহে নামায এমনই এক বড় দৌলত যে, উহাকে

সঠিকভাবে আদায় করার ফল ইহাই যে, উহা অসঙ্গত কাজ হইতে বিরত রাখে। যদি বিরত না রাখে তবে বুঝিতে হইবে নামায অসম্পূর্ণ রহিয়াছে—এই বিষয়টি বহু হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, নামাযের মধ্যে গুনাহ হইতে বাধা দেওয়ার ও সরানোর শক্তি রহিয়াছে।

হযরত আবুল আলিয়াহ (রাযিঃ) বলেন, আল্লাহ তায়ালার এরশাদ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى –এর উদ্দেশ্য হইল, নামাযের মধ্যে তিনটি জিনিস রহিয়াছে—এখলাস, আল্লাহর ভয় এবং আল্লাহর যিকির, যে নামাযের মধ্যে এই তিনটি জিনিস নাই, উহা নামাযই নয়। এখলাস নেককাজের হুকুম করে, আল্লাহর ভয় অন্যায় কাজ হইতে ফিরাইয়া রাখে, আর আল্লাহর যিকির হইল কুরআন পাক যাহা স্বয়ং নেক কাজের হুকুম করে এবং অন্যায় কাজ হইতে ফিরাইয়া রাখে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন, যে নামায অন্যায় ও অশোভনীয় কাজ হইতে বিরত না রাখে, সেই নামায আল্লাহর নৈকট্যের পরিবর্তে দূরত্ব সৃষ্টি করে। হযরত হাসান (রাযিঃ)ও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে ইহাই নকল করেন যে, যে ব্যক্তির নামায তাহাকে মন্দকাজ হইতে বিরত না রাখে উহা নামাযই নহে ; বরং ঐ নামায দ্বারা আল্লাহ হইতে দূরত্ব সৃষ্টি হয়।

হযরত ইবনে ওমর (রাযিঃ)ও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ নকল করিয়াছেন। হযরত ইবনে মাসঊদ (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি নামাযের হুকুম মান্য করিল না তাহার নামাযই বা কি? নামাযের হুকুম মান্য করার অর্থ হইল, ফাহেশা ও মন্দ কাজ হইতে বিরত থাকে।

হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন, এক ব্যক্তি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অমুক ব্যক্তি রাত্রে নামায পড়িতে থাকে কিন্তু সকাল হইতে চুরি করে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, অতি শীঘ্রই তাহার নামায তাহাকে এই মন্দ কাজ হইতে ফিরাইয়া দিবে। (দুররে মানসূর) এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, যদি কেহ মন্দ কাজে লিপ্ত থাকে তবে তাহার গুরুত্ব সহকারে নামাযে মগ্ন হওয়া উচিত, তাহা হইলে খারাপ কাজ বা মন্দ অভ্যাসগুলি আপনা আপনিই দূর হইয়া যাইবে। একটি একটি করিয়া মন্দ অভ্যাসগুলি ত্যাগ করা যেমন কঠিন তেমনি সময়সাপেক্ষ ; কিন্তু গুরুত্ব সহকারে নামাযে মগ্ন হওয়া যেমন সহজ

তেমনি সময়সাপেক্ষও নহে, উহার বরকতে মন্দ অভ্যাসগুলি তাহার মধ্য হইতে আপনা-আপনিই দূর হইয়া যাইতে থাকিবে। আল্লাহ তায়ালা আমাকেও সুন্দরভাবে নামায পড়ার তওফীক দান করুন।

(٨) عَنْ جَابِرٍؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْضَلُ الصَّلٰوةِ طُوْلُ الْقُنُوْتِ ۔ اخرجه ابن ابی شیبة ومسلم والترمذی وابن ماجة كذا فی الدر المنثور وفیه ایضًا عَنْ مُجَاهِدٍ فِیْ قَوْلِهٖ تَعَالٰی وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِیْنَ قَالَ مِنَ الْقُنُوْتِ الرُّكُوْعُ وَالْخُشُوْعُ وَطُوْلُ الرُّكُوْعِ يَعْنِیْ طُوْلَ الْقِيَامِ وَغَضُّ الْبَصَرِ وَخَفْضُ الْجَنَاحِ وَالرَّهْبَةُ لِلّٰهِ وَكَانَ الْفُقَهَاءُ مِنْ اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَامَ اَحَدُهُمْ فِی الصَّلٰوةِ يَهَابُ الرَّحْمٰنَ سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰی اَنْ يَّلْتَفِتَ اَوْ يُقَلِّبَ الْحَصٰى اَوْ يَشُدَّ بَصَرَهٗ اَوْ يَعْبَثَ بِشَیْءٍ اَوْ يُحَدِّثَ نَفْسَهٗ بِشَیْءٍ مِّنْ اَمْرِ الدُّنْيَا اِلَّا نَاسِيًا حَتّٰى يَنْصَرِفَ ۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ افضل نماز وہ ہے جس میں لمبی لمبی رکعتیں ہوں، مجاہد کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ شانہٗ کے ارشاد وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِیْنَ (اور نماز میں) کھڑے رہو اللہ کے سامنے مؤدب، اس آیت میں رکوع بھی داخل ہے اور خشوع بھی اور لمبی رکعت ہونا بھی اور آنکھوں کو پست کرنا، بازوؤں کو جھکانا (یعنی اکڑ کے کھڑا نہ ہونا) اور اللہ سے ڈرنا بھی شامل ہے کہ لفظ قنوت میں جس کا اس آیت میں حکم دیا گیا یہ سب چیزیں داخل ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ میں سے جب کوئی شخص نماز کو کھڑا ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا تھا اس بات سے کہ ادھر ادھر دیکھے یا سجدہ میں جاتے ہوئے کنکریوں کو الٹ پلٹ کرے (عرب میں صفوں کی جگہ کنکریاں بچھائی جاتی ہیں) یا کسی لغو چیز میں مشغول ہو یا دل میں کسی دنیاوی چیز کا خیال لائے۔ ہاں بھول کے خیال آگیا ہو تو دوسری بات ہے۔

(اخرجه سعید بن منصور وعبد بن حمید وابن جریر وابن المنذر وابن حاتم والاصبهانی فی الترغیب والبیهقی فی شعب الایمان اه وهذا اٰخر ما اردت ایراده فی هٰذه العجالة رعایة لعدد الاربعین والله ولی التوفیق وقد وقع الفراغ منه لیلة الترویة من سنة سبع وخمسین بعد الالف وثلث مائة والحمد لله اولا واٰخرا)

(৮) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, ঐ নামায উত্তম, যাহাতে রাকাতসমূহ দীর্ঘ হয়। (দুররে মানসূর, মুসলিম)

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, আল্লাহ তায়ালার এরশাদ قُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِیْنَ

অর্থাৎ (এবং নামাযে) 'আল্লাহর সম্মুখে আদবের সহিত দাঁড়াইয়া থাক' এই আয়াতের মধ্যে খুশুর সহিত নামায পড়া, রাকাত দীর্ঘ হওয়া, দৃষ্টি অবনত রাখা, বাহুদ্বয় ঝুকাইয়া রাখা (অর্থাৎ দর্পভরে না দাঁড়ানো) এবং আল্লাহকে ভয় করা ইত্যাদি সবই শামিল রহিয়াছে। কেননা উল্লেখিত আয়াতে আদেশকৃত 'কুনূত' শব্দের মধ্যে এই সবকিছু অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন সাহাবী যখন নামাযে দাঁড়াইতেন, তখন এদিক সেদিক দৃষ্টি করা বা সেজদায় যাওয়ার সময় কংকর উলট-পালট করা (আরব দেশে কাতারের জায়গায় কংকর বিছানো হইত) বা বেহুদা কোন কিছুতে মশগুল হওয়া বা অন্তরে দুনিয়াবী কোন চিন্তা করা ইত্যাদি বিষয়ে তাঁহারা আল্লাহকে ভয় করিতেন। হাঁ, ভুলবশতঃ কোন খেয়াল আসিয়া পড়িলে তাহা ভিন্ন কথা।

(তারগীব ঃ সাঈদ ইবনে মানসূর)

ফায়দা ঃ قُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِیْنَ আয়াতের বিভিন্ন তফসীর বর্ণিত হইয়াছে—এক তফসীর মতে ইহার অর্থ চুপ-চাপ থাকা। ইসলামের শুরু যমানায় নামাযের মধ্যে কথা বলা, সালামের জওয়াব দেওয়া ইত্যাদি জায়েয ছিল। কিন্তু যখন উক্ত আয়াত নাযিল হইল, তখন হইতে নামাযে কথা বলা নাজায়েয হইয়া যায়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ইহার অভ্যাস করাইয়া ছিলেন যে, যখনই আমি উপস্থিত হইতাম তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে থাকিলেও তাঁহাকে সালাম করিতাম আর তিনি উহার জওয়াব প্রদান করিতেন। একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে মশগুল ছিলেন, আমি উপস্থিত হইয়া অভ্যাস অনুযায়ী তাঁহাকে সালাম দিলাম হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন না। আমি চিন্তিত হইয়া পড়িলাম। ভাবিলাম, হয়ত আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে আমার সম্পর্কে কোন অসন্তুষ্টি নাযিল হইয়াছে। নতুন ও পুরাতন চিন্তাসমূহ আমাকে ঘিরিয়া ফেলিল। পুরানা কথাসমূহ চিন্তা করিতেছিলাম যে, হয়তঃ অমুক কথার কারণে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার প্রতি নারাজ হইয়াছেন কিংবা অমুক কাজের দরুন তিনি নারাজ হইয়াছেন। অতঃপর যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষ করিলেন তখন বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা তাঁহার হুকুমসমূহের মধ্যে যাহা ইচ্ছা পরিবর্তন ঘটান—তিনি নামাযের মধ্যে কথা বলা নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। অতঃপর এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন। আরও এরশাদ করিলেন যে, নামাযের মধ্যে আল্লাহর যিকির,

তাসবীহ এবং তাঁহার হামদ–সানা ব্যতীত কোনপ্রকার কথা বলা জায়েয নয়।

হযরত মুআবিয়া ইবনে হাকাম সুলামী (রাযিঃ) বলেন, ইসলাম গ্রহণের জন্য যখন আমি মদীনা শরীফে হাজির হই তখন আমাকে অনেক কিছু শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। তন্মধ্যে ইহাও একটি ছিল যে, কেহ হাঁচি দিয়া 'আল–হামদুলিল্লাহ' বলিলে উহার উত্তরে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলিতে হয়। যেহেতু নতুন শিক্ষা ছিল, কাজেই তখনও জানা ছিল না যে, নামাযের মধ্যে ইহা বলা যায় না। এক ব্যক্তি নামাযের মধ্যে হাঁচি দিলে আমি উত্তরে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলিলাম। আশে–পাশের লোকেরা সতর্ক করার উদ্দেশ্যে আমার দিকে চোখ বড় করিয়া তাকাইল। আমার তখনও জানা ছিল না যে, নামাযের মধ্যে কথা বলা যায় না। তাই আমি বলিয়া উঠিলাম, হায় আফসোস! তোমাদের কি হইল যে, তোমরা আমার দিকে চোখ বড় করিয়া তাকাইতেছ?তাহারা ইশারা করিয়া আমাকে চুপ করাইয়া দিল। আমার কিছুই বুঝে আসিল না তবু আমি চুপ হইয়া গেলাম।

নামায শেষ হইবার পর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাহার উপর আমার মা–বাপ কুরবান হউন) আমাকে না মারিলেন, না ধমক দিলেন, না কোনরূপ কটু কথা বলিলেন, বরং এইটুকু বলিলেন যে, নামাযের ভিতর কথা বলা জায়েয নয়—নামায শুধু তসবীহ, তকবীর এবং কুরআন তেলাওয়াতেরই স্থান। আল্লাহর কসম! হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মত স্নেহশীল উস্তাদ আমি ইতিপূর্বেও কখনও দেখি নাই এবং পরেও দেখি নাই।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত এক তফসীর মতে 'কানিতীন'–এর অর্থ হইল 'খাশিয়ীন' অর্থাৎ খুশুর সহিত নামায আদায়কারী। এই তফসীর অনুযায়ীই হযরত মুজাহিদের বর্ণনা উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, রাকাত দীর্ঘ হওয়া, খুশু–খুজুর সহিত নামায পড়া, দৃষ্টি নীচের দিকে রাখা, আল্লাহকে ভয় করা ইত্যাদি বিষয়ও খুশুর অন্তর্ভুক্ত।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, প্রথম প্রথম হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রাত্রে নামাযে দাঁড়াইতেন তখন ঘুমের ঘোরে নামাযের মধ্যে যাহাতে পড়িয়া না যান, সেইজন্য নিজেকে রশি দ্বারা বাঁধিয়া লইতেন। ইহার'ই পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় ঃ

طٰهٰ ۚ مَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰٓى

অর্থাৎ হে প্রিয় হাবীব! আপনি (এইরূপ) অতি মাত্রায় কষ্ট করিবেন এই জন্য আমি আপনার উপর কুরআন নাযিল করি নাই।

(সূরা ত্বহা, আয়াত ঃ ১–২)

আর এই বিষয়টি তো কয়েকটি হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত লম্বা লম্বা রাকাত পড়িতেন যে, দীর্ঘ সময় দাঁড়াইয়া থাকার কারণে তাঁহার পা মোবারক ফুলিয়া যাইত। যদিও আমাদের প্রতি অতিরিক্ত স্নেহের কারণে তিনি এরশাদ করিয়াছেন যে, যতটুকু তোমরা বরদাশত করিতে পার ততটুকুই মেহনত কর ; এমন যেন না হয় যে, ক্ষমতার বাহিরে মেহনত করার কারণে সবই থাকিয়া যায়। একজন মহিলা সাহাবী এইভাবে নিজেকে রশিতে বাঁধিয়া নামায পড়িতে শুরু করিয়াছিলেন। তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। তবে ইহা অবশ্যই মনে রাখিতে হইবে যে, সহ্য–ক্ষমতার ভিতরে নামায যত বেশী দীর্ঘ করা হইবে ততই উহা উত্তম ও উৎকৃষ্ট হইবে। কারণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে পা মোবারক ফুলিয়া যাওয়ার মত দীর্ঘ সময় দাঁড়াইয়া নামায পড়িতেন উহার পিছনে কোন রহস্য তো অবশ্যই আছে। এমনকি সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) আরজ করিতেন যে, আল্লাহ তায়ালা সূরা ফাত্‌হের মধ্যে আপনাকে ক্ষমা করিয়া দেওয়ার ওয়াদা করিয়াছেন, তবুও আপনি এত কষ্ট করিতেছেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইতেন, তবে আমি আল্লাহর শোকর গুজার বান্দা কেন হইব না?

এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায পড়িতেন, তখন তাঁহার সীনা মোবারক হইতে যাঁতাকলের আওয়াজের ন্যায় অবিরাম ক্রন্দনের আওয়াজ (শ্বাস রুদ্ধ হওয়ার কারণে) বাহির হইত। অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, ফুটন্ত ডেগচীর ন্যায় আওয়াজ বাহির হইত। (তারগীব)

হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন, বদরের যুদ্ধে আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি গাছের নীচে সারারাত্রি দাঁড়াইয়া নামায পড়িতে এবং ক্রন্দন করিতে দেখিয়াছি। আরও বিভিন্ন হাদীসে এরশাদ হইয়াছে, আল্লাহ তায়ালা কতিপয় লোকের উপর খুবই খুশী হন। তাহাদের মধ্যে একজন হইল ঐ ব্যক্তি, যে শীতের রাত্রে নরম বিছানায় লেপ জড়াইয়া রহিয়াছে, পার্শ্বে প্রাণ প্রিয়তমা স্ত্রী শুইয়া আছে তথাপি সে তাহাজ্জুদের জন্য উঠে ও নামাযে মশগুল হয়। আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর খুবই খুশী হন ও আশ্চর্য প্রকাশ করেন। আলেমুল–গায়েব হওয়া

—১২

সত্ত্বেও গর্ব করিয়া তিনি ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, এইভাবে দাঁড়াইয়া নামায পড়িবার জন্য এই বান্দাকে কোন্ জিনিসে বাধ্য করিয়াছে? ফেরেশতাগণ আরজ করেন, আপনার দয়া ও দানের আশা এবং আপনার শাস্তির ভয়। তখন আল্লাহ তায়ালা বলেন, সে আমার কাছে যে জিনিসের আশা করিয়াছে তাহা আমি দান করিলাম এবং যে জিনিসের ভয় করিয়াছে উহা হইতে নিরাপত্তা দিলাম।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহর পক্ষ হইতে বান্দার জন্য ইহা হইতে উত্তম পুরস্কার আর নাই যে, তাহাকে দুই রাকাত নামায পড়ার তওফীক দিলেন।

কুরআন ও হাদীসে বহু জায়গায় বর্ণিত হইয়াছে যে, ফেরেশতাগণ সর্বদা আল্লাহর এবাদতে মশগুল থাকেন। বহু হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, ফেরেশতাদের এক জামাত কিয়ামত পর্যন্ত রুকুতেই মশগুল থাকিবে, তদ্রূপ এক জামাত সর্বদা সেজদায় মশগুল থাকে, আরেক জামাত সর্বদা দাঁড়াইয়া থাকে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা মুমিন বান্দাকে এইভাবে বিশেষ সম্মান দান করিয়াছেন যে, ফেরেশতাদের সব এবাদতের সমষ্টি তাহাকে দুই রাকাত নামাযের মধ্যে দান করিয়াছেন। এই সবকিছুই দুই রাকাতের মধ্যে রহিয়াছে, যাহাতে ফেরেশতাদের সব এবাদত হইতে সে অংশ পায়। তদুপরি নামাযের মধ্যে কুরআন তেলাওয়াত তাহাদের এবাদত হইতে অতিরিক্ত দান করিয়াছেন। সুতরাং ফেরেশতাদের এবাদতের সমষ্টি দ্বারা তখনই প্রকৃত স্বাদ ও আনন্দ পাওয়া যাইবে, যখন তাহা ফেরেশতাদের ছিফাত ও গুণাবলীর সহিত আদায় করা হইবে। এইজন্যই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, নামাযের জন্য নিজ কোমর ও পেটকে হালকা রাখ। কোমর হালকা রাখার অর্থ হইল, নিজেকে দুনিয়ার ঝামেলায় বেশী জড়াইও না আর পেট হালকা রাখার অর্থ হইল, পেট ভরিয়া খাইও না। কারণ ইহা দ্বারা অলসতা পয়দা হয়। (জামে সগীর)

সুফীয়ায়ে কেরাম বলেন, নামাযের মধ্যে বার হাজার বিষয় রহিয়াছে, এই সবগুলিকে আল্লাহ তায়ালা বারটির মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। নামাযকে পরিপূর্ণ ও সর্বাঙ্গীণ সুন্দর করার জন্য এই বারটি বিষয়ের প্রতি নজর রাখা একান্ত জরুরী। বারটি বিষয় হইল ঃ

(১) এলেম ঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, এলেমের সহিত অল্প আমল ও মূর্খতার সহিত অধিক আমল অপেক্ষা উত্তম। (২) ওযূ (৩) পোশাক (৪) নামাযের ওয়াক্ত (৫) কেবলামুখী হওয়া (৬) নিয়ত (৭) তকবীরে তাহরীমা (৮) দাঁড়াইয়া নামায

পড়া (৯) কুরআন শরীফ পড়া (১০) রুকু করা (১১) সেজদা করা (১২) আত্তাহিয়্যাতু পাঠে বসা। এই বারটি জিনিসের পূর্ণতা আসিবে এখলাসের মাধ্যমে।

এই বারটি বিষয়ের প্রত্যেকটির তিনটি করিয়া অংশ আছে। এলেমের তিনটি অংশ হইতেছে ঃ

(১) ফরজ এবং সুন্নতসমূহকে ভিন্ন ভিন্ন করিয়া জানা (২) ওযূ এবং নামাযে কয়টি ফরজ আর কয়টি সুন্নত সেইগুলি জানা (৩) শয়তান কোন্ কোন্ উপায়ে নামাযে বিঘ্ন সৃষ্টি করে তাহা জানা।

ওযূতে তিনটি অংশ হইতেছে ঃ (১) বাহিরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে যেভাবে পাক করা হয় তদ্রূপ অন্তরকেও হিংসা-বিদ্বেষ হইতে পাক করা। (২) বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে গোনাহ হইতে পাক রাখা (৩) ওযূ করার সময় প্রয়োজনের চাইতে কম বা বেশী পানি খরচ না করা।

পোশাকের তিনটি অংশ হইতেছে ঃ

(১) হালাল উপার্জন দ্বারা হওয়া (২) পাক হওয়া (৩) সুন্নত মুতাবেক হওয়া অর্থাৎ টাখনু ইত্যাদি যেন ঢাকা না পড়ে, গর্ব ও অহংকারের জন্য পরিধান না করা হয়।

অতঃপর ওয়াক্তের ব্যাপারেও তিনটি বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখা জরুরী ঃ

(১) সঠিক সময় জানার জন্য সূর্য, তারকা ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রাখা, যাহাতে সঠিক সময় জানা যায়। (বর্তমানে ঘড়ির সাহায্যে এই কাজ করা সম্ভব হইতেছে) (২) আযানের খবর রাখা (৩) সর্বদা নামাযের প্রতি মনে খেয়াল রাখা। যেন বেখেয়ালীতে নামাযের ওয়াক্ত চলিয়া না যায়।

কেবলামুখী হওয়ার ব্যাপারেও তিনটি বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখা ঃ

(১) শরীরকে কেবলার দিকে রাখা (২) অন্তরকে আল্লাহর দিকে রুজু করা, কেননা অন্তরের কা'বা আল্লাহ তায়ালাই (৩) মালিক ও মনিবের সম্মুখে যেরূপ আপাদমস্তক নিষ্ঠা ও মনোযোগের সহিত থাকিতে হয়, সেইরূপ থাকা।

নিয়তও তিনটি জিনিসের উপর নির্ভরশীল ঃ

(১) কোন্ ওয়াক্তের নামায পড়িতেছে উহা ঠিক করা (২) এই ধ্যান করা যে, আমি আল্লাহর সামনে দাঁড়াইয়াছি ; তিনি আমাকে দেখিতেছেন (৩) এই ধ্যান করা যে, আল্লাহ তায়ালা অন্তরের অবস্থাও দেখেন।

তকবীরে তাহরীমার সময়ও তিনটি জিনিসের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে ঃ

(১) শব্দের উচ্চারণ শুদ্ধ হওয়া (২) কান পর্যন্ত হাত উঠানো (যেন এইদিকে ইঙ্গিত করা হইল যে, আল্লাহ ব্যতীত আর সবকিছুকে পিছনে ফেলিয়া দিলাম) (৩) আল্লাহু আকবার বলার সময় আল্লাহর মহত্ত্ব ও বড়ত্ব অন্তরে বিদ্যমান থাকে।

দাঁড়ানোর মধ্যে যে তিনটি বিষয় রহিয়াছে সেইগুলি এই ঃ

(১) দৃষ্টি সেজদার জায়গাতে রাখিবে (২) অন্তরে আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর ধ্যান করিবে (৩) অন্য কোন দিকে মনোযোগ দিবে না। নামাযের মধ্যে এদিক-সেদিক তাকানোর উদাহরণ হইল এইরূপ যে, কোন ব্যক্তি বাদশাহর দারোয়ানকে অনেক খোশামেদ তোষামোদ করিয়া বহু কষ্টে বাদশাহর দরবারে পৌঁছিল এবং বাদশাহ যখন তাহার কথা শোনার জন্য মনোযোগী হইলেন ; তখন সে ব্যক্তি এদিক-সেদিক তাকাইতে লাগিল। এমতাবস্থায় বাদশাহ কি তাহার প্রতি দৃষ্টি দিবেন?

কুরআন পড়ার মধ্যেও তিনটি বিষয় খেয়াল করিবে ঃ

(১) সহীহ-শুদ্ধভাবে তেলাওয়াত করিবে (২) কুরআনের অর্থে গভীরভাবে চিন্তা করিবে (৩) যাহা পড়িবে উহার উপর আমল করিবে।

রুকুর মধ্যে তিনটি অংশ হইতেছে ঃ

(১) রুকুর মধ্যে কোমর উঁচু-নীচু না রাখিয়া একেবারে সোজা রাখা (আলেমগণ লিখিয়াছেন, মাথা, কোমর ও নিতম্ব বরাবর থাকিবে) (২) হাতের অঙ্গুলিসমূহ খুলিয়া চওড়া করিয়া হাঁটুর উপর রাখা (৩) তসবীহসমূহ ভক্তি ও আজমতের সহিত পড়া।

সেজদার মধ্যেও তিনটি জিনিসের খেয়াল করিবে ঃ

(১) সেজদার মধ্যে দুই হাত কান বরাবর রাখা (২) দুই হাতের কনুই খাড়া রাখা (৩) আজমতের সহিত তসবীহসমূহ পড়া।

বসা অবস্থায় তিন বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখিবে ঃ

(১) ডান পা খাড়া করিয়া বাম পায়ের উপর বসা (২) অর্থের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আজমতের সহিত আত্তাহিয়্যাতু পড়া, কেননা ইহাতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সালাম ও মুমিনদের জন্য দোয়া রহিয়াছে (৩) সালাম ফিরাইবার সময় ফেরেশতা এবং উভয় দিকের মুসল্লীদের প্রতি সালামের নিয়ত করা।

অতঃপর এখলাসেরও তিনটি অংশ রহিয়াছে ঃ

(১) নামাযের দ্বারা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য হওয়া। (২) মনে করা যে, আল্লাহর তওফীকেই এই নামায আদায় হইয়াছে। (৩) সওয়াবের আশা রাখা।

প্রকৃতপক্ষে নামাযের মধ্যে অনেক কল্যাণ ও বরকত রহিয়াছে। ইহাতে যাহা কিছু পড়া হয়, উহার প্রত্যেকটি অংশই অসংখ্য গুণাগুণ ও আল্লাহর মহত্ত্বের সমষ্টি।

সর্বপ্রথম যে দোয়াটি পড়া হয়, উহাকেই লক্ষ্য করিলে দেখা যায়—ইহা কত ফযীলতপূর্ণ। যেমন—

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ

"হে আল্লাহ! আমি তোমার পবিত্রতা বয়ান করিতেছি। তুমি যাবতীয় দোষ-ত্রুটি হইতে পবিত্র, যাবতীয় অন্যায় হইতে মুক্ত।"

وَبِحَمْدِكَ

"যাবতীয় প্রশংসা তোমারই জন্য এবং প্রশংসনীয় যাবতীয় বিষয় তুমিই একমাত্র যোগ্য।"

وَتَبَارَكَ اسْمُكَ

"তোমার নাম এতই বরকতপূর্ণ যে, যে কোন জিনিসের উপর তোমার নাম লওয়া যায়, উহাও বরকতপূর্ণ হইয়া যায়।"

وَتَعَالٰى جَدُّكَ

"তোমার শান ও মর্যাদা বহু উর্ধ্বে ; সবার উপরে।"

وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ

"তুমি ছাড়া কোন মাবুদ নাই ; এবাদতের যোগ্য কেহ কখনও হয় নাই এবং হইবেও না।"

অনুরূপভাবে রুকুর মধ্যে বলা হয়—

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ

"আজমত ও মহত্বের মালিক আমার রব্ব সকল দোষ-ত্রুটি হইতে সম্পূর্ণ পবিত্র।" এইভাবে আল্লাহর মহত্বের সামনে নিজের অক্ষমতা ও অসহায়তা প্রকাশ করা হইতেছে। কেননা ঘাড় উঁচু করা অহঙ্কারের লক্ষণ আর উহা ঝুকাইয়া দেওয়া আনুগত্যের লক্ষণ। সুতরাং রুকুর মধ্যে যেন ইহা স্বীকার করিয়া লওয়া হইল যে, হে আল্লাহ! তোমার যাবতীয় হুকুম-আহকামের সামনে আমি মাথা নত করিতেছি, তোমার আনুগত্য ও বন্দেগীকে আমি শিরোধার্য করিয়া লইতেছি, আমার এই পাপী দেহখানি তোমার সামনে হাজির ; তোমার দরবারে অবনত হইয়া রহিয়াছে—নিঃসন্দেহে তুমি মহান; তোমার মহত্ত্বের সামনে আমি মাথা নত করিলাম।

অনুরূপভাবে সেজদার মধ্যে বলা হয়—

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى

ইহার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার সীমাহীন উচ্চ মর্যাদা ও মহত্ব স্বীকার করার সাথে সাথে যাবতীয় দোষ-ক্রুটি হইতে তাঁহার পবিত্রতা স্বীকার করা হইতেছে। শরীরের সর্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গ হইল মাথা—চোখ, কান, নাক, জবান ইত্যাদি প্রিয় অঙ্গগুলি সহকারে এই মাথা মাটিতে রাখিয়া যেন স্বীকার করা হইতেছে যে, আমার শ্রেষ্ঠতম ও প্রিয় অঙ্গগুলি তোমার সামনে মাটিতে লুটাইয়া আছে, শুধু এই আশায় যে, তুমি আমার উপর দয়া ও মেহেরবানী করিবে। এই বিনয়ের প্রথম প্রকাশ আদবের সহিত তাহার সম্মুখে দুই হাত বাঁধিয়া দাঁড়ানোর মধ্যে ছিল। রুকুতে মাথা নত করার মধ্যে এই বিনয়েরই আরেক ধাপ উন্নতি হইয়াছিল। অতঃপর তাহার সামনে জমিনে নাক ঘঁষা ও মাথা রাখার মধ্যে আরো এক ধাপ উন্নতি হইল। এইভাবে শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ নামাযেরই এই অবস্থা। বাস্তবিক পক্ষে ইহাই হইল নামাযের আসল রূপ। আর এই নামাযই প্রকৃতপক্ষে দ্বীন ও দুনিয়ার যাবতীয় উন্নতি ও সফলতার সিঁড়ি। আল্লাহ তায়ালা দয়া করিয়া আমাকে এবং সমস্ত মুসলমানকে এইরূপ নামায পড়ার তওফীক দান করুন—আমীন।

হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, ফকীহ সাহাবায়ে কেরামের নামায এইরূপই ছিল। তাহারা নামাযের সময় আল্লাহর ভয়ে ভীত হইয়া পড়িতেন। হযরত হাসান (রাযিঃ) যখন ওযূ করিতেন তখন তাহার চেহারা বিবর্ণ হইয়া যাইত। জনৈক ব্যক্তি ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, দেখ, এক জবরদস্ত বাদশাহর দরবারে উপস্থিত হইবার সময় আসিয়াছে। অতঃপর তিনি ওযূ করিয়া যখন মসজিদের দিকে যাইতেন, মসজিদের দরজায় দাঁড়াইয়া বলিতেন ঃ

اِلٰهِىْ عَبْدُكَ بِبَابِكَ يَا مُحْسِنُ قَدْ اَتَاكَ الْمُسِيْئُ وَقَدْ اَمَرْتَ الْمُحْسِنَ مِنَّا اَنْ يَّتَجَاوَزَ عَنِ الْمُسِيْئِ

فَاَنْتَ الْمُحْسِنُ وَاَنَا الْمُسِيْئُ فَتَجَاوَزْ عَنْ قَبِيْحِ مَا عِنْدِىْ بِجَمِيْلِ مَا عِنْدَكَ يَا كَرِيْمُ

“হে আল্লাহ! তোমার বান্দা তোমার দরজায় হাজির। হে অনুগ্রহকারী ও উত্তম আচরণকারী! গোনাহগার তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছে। তুমি হুকুম করিয়াছ আমাদের সৎলোকেরা যেন অসৎ লোকদেরকে ক্ষমা করিয়া দেয়। হে আল্লাহ! তুমি নেককার আর আমি বদকার। কাজেই হে কারীম! তুমি তোমার যাবতীয় গুণাবলীর ওসীলায় আমার যাবতীয় অন্যায় ক্ষমা

করিয়া দাও।” এই দোয়া করিয়া তিনি মসজিদে প্রবেশ করিতেন।

হযরত যয়নুল আবেদীন (রহঃ) দৈনিক এক হাজার রাকাত নামায পড়িতেন। বাড়ীতে বা সফরে কখনও তাঁহার তাহাজ্জুদ ছুটে নাই। তিনি যখন ওযূ করিতেন তখন তাঁহার চেহারা হলুদবর্ণ হইয়া যাইত এবং নামাযে দাঁড়াইলে তাঁহার শরীরে কম্পন শুরু হইয়া যাইত। কেহ ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, তুমি কি জান না, কাহার সম্মুখে দাঁড়াইতেছি।

একবার তিনি নামায পড়িতেছিলেন এমন সময় ঘরে আগুন লাগিয়া গেল। তিনি নামাযেই মশগুল থাকিলেন। লোকেরা কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, আখেরাতের আগুন দুনিয়ার আগুন হইতে গাফেল করিয়া রাখিয়াছে। তিনি বলেন, অহংকারী মানুষের উপর আমি আশ্চর্য হই—গতকাল পর্যন্ত যে নাপাক বীর্য ছিল আবার আগামীকাল সে মুর্দা হইয়া যাইবে তবুও সে অহংকার করে। তিনি বলিতেন, আশ্চর্যের বিষয়! মানুষ অস্থায়ী ঘরের জন্য কতই না ফিকির করে অথচ চিরস্থায়ী ঘরের জন্য কোনই ফিকির নাই। তাঁহার অভ্যাস ছিল, রাত্রের অন্ধকারে চুপে চুপে তিনি দান করিতেন। কেহ জানিতে পারিত না, কে দান করিয়াছে। তাহার মৃত্যুর পর এমন একশত পরিবারের সন্ধান পাওয়া গেল যাহারা তাঁহারই সাহায্যের উপর চলিত। (নুজহাহ্)

হযরত আলী (রাযিঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, যখন নামাযের সময় হইত তখন তাহার চেহারার রং বদলাইয়া যাইত, শরীরে কম্পন শুরু হইয়া যাইত। জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, ঐ আমানত আদায় করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে, যাহা আসমান-যমীন বহন করিতে পারে নাই, পাহাড়-পর্বত যাহা বহন করিতে অক্ষম হইয়া গিয়াছে—জানিনা আমি সেই আমানত পুরাপুরি আদায় করিতে পারিব কিনা।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) যখন আযানের আওয়াজ শুনিতেন, তখন এত বেশী কাঁদিতেন যে, তাহার চাদর ভিজিয়া যাইত, রগ ফুলিয়া যাইত, চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া যাইত। কেহ আরজ করিল, আমরাও তো আযান শুনি কিন্তু কোন প্রতিক্রিয়াই হয় না অথচ আপনি এত বেশী ঘাবড়াইয়া যান! তিনি বলিলেন, মুআয্যিন কি বলে, তাহা যদি লোকেরা জানিত তবে তাহাদের আরাম আয়েশ হারাম হইয়া যাইত এবং ঘুম উড়িয়া যাইত। অতঃপর তিনি আযানের প্রত্যেকটি বাক্যের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন।

এক ব্যক্তি বর্ণনা করেন, আমি হযরত যুন্নূন মিছরী (রহঃ)এর পিছনে আছরের নামায পড়িলাম। তকবীরে তাহরীমার সময় আল্লাহ বলার সাথে সাথে তাহার উপর আল্লাহর আজমত ও মহত্বের এত প্রভাব পড়িল যে, মনে হইল তাহার দেহ হইতে রূহ বাহির হইয়া গিয়াছে এবং তিনি একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেলেন। অতঃপর তাহার জবান হইতে যখন 'আকবার' শব্দটি শুনিলাম, তখন তাহার এই তকবীরের প্রভাবে আমার অন্তর যেন টুকরা টুকরা হইয়া গেল। (নুজহাহ্)

হযরত উয়াইস কারনী (রহঃ) বিখ্যাত বুযুর্গ ও শ্রেষ্ঠ তাবেয়ী ছিলেন। কোন কোন সময় সারা রাত্র রুকুর হালতে কাটাইয়া দিতেন। আবার কোন কোন সময় এমন হইত যে, এক সেজদার মধ্যেই সারা রাত্র কাটাইয়া দিতেন।

হযরত ইসাম (রহঃ) হযরত হাতেম যাহেদ বলখী (রহঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি নামায কিরূপে পড়েন? তিনি উত্তর করিলেন, নামাযের সময় হইলে প্রথমে ধীর-স্থিরভাবে উত্তমরূপে ওযূ করি অতঃপর নামাযের জায়গায় উপস্থিত হইয়া ধীর-স্থিরভাবে দাঁড়াই আর মনে মনে এই ধ্যান করিতে থাকি যে, কাবা শরীফ আমার সম্মুখে, পা আমার পুলসিরাতের উপর, ডান দিকে বেহেশত আর বাম দিকে দোযখ, আজরাঈল (আঃ) আমার মাথার উপর এবং আমি মনে করি ইহাই আমার শেষ নামায ; জীবনে আর নামায পড়ার সুযোগ হয়ত আমার হইবে না, আর আমার মনের অবস্থা আল্লাহ তায়ালা জানেন। ইহার পর খুবই বিনয়ের সহিত আল্লাহ আকবার বলি অতঃপর অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কেরাত পড়ি। বিনয়ের সহিত রুকু করি আর বিনয়ের সহিত সেজদা করি। ধীর-স্থিরভাবে নামায পুরা করি আর আল্লাহর রহমতের ওসীলায় উহা কবুল হওয়ার আশা করি। আবার নিজের বদ-আমলের দরুন উহা অগ্রাহ্য হওয়ার ভয়ও করি। ইসাম (রহঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, এইরূপ নামায আপনি কত দিন যাবত পড়িতেছেন? তিনি বলিলেন, ত্রিশ বৎসর যাবত। ইহা শুনিয়া ইসাম (রহঃ) কাঁদিতে লাগিলেন যে, একটি নামাযও আমার এইরূপে আদায় করার সৌভাগ্য হয় নাই।

বর্ণিত আছে, একদিন হাতেম (রহঃ)এর নামাযের জামাত ছুটিয়া গেল, ইহাতে তিনি খুবই দুঃখিত হইলেন। মাত্র দুই একজন এই ব্যাপারে সমবেদনা প্রকাশ করিল। ইহাতে তিনি ক্রন্দন করিয়া বলিলেন, হায়! আজ যদি আমার ছেলে মারা যাইত তবে বলখের অর্ধেক লোক সমবেদনা প্রকাশ করিত। এক রেওয়ায়াতে আসিয়াছে যে, দশ হাজারেরও অধিক

লোক সমবেদনা প্রকাশ করিত অথচ আমার জামাত নষ্ট হওয়াতে মাত্র দুই-একজন লোক দুঃখ প্রকাশ করিল। ইহা শুধু এইজন্যই যে, মানুষের নিকট ধর্মীয় মুসীবত দুনিয়ার মুসীবত হইতে হালকা হইয়া গিয়াছে।

হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব (রহঃ) বলেন, বিশ বৎসরের মধ্যে কখনও এমন হয় নাই যে, নামাযের জন্য আযান হইয়াছে অথচ আমি পূর্ব হইতেই মসজিদে হাজির হই নাই। মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসে (রহঃ) বলেন, দুনিয়াতে শুধু তিনটি জিনিসই আমার পছন্দ ঃ প্রথম এমন বন্ধু যে আমার ভুল-ত্রুটির জন্য আমাকে সতর্ক করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ জীবন ধারণের পরিমাণ রুজি যাহাতে কোন কলহ-বিবাদ নাই। তৃতীয়ঃ জামাতের সহিত নামায আদায়, যাহাতে ভুল-ত্রুটি হইলে মাফ হইয়া যায়। আর সওয়াব হইলে উহা আমাকে দেওয়া হয়।

হযরত আবু উবাইদাহ ইবনে জার্রাহ (রাযিঃ) একবার নামাযে ইমামতি করিলেন। নামায শেষ করিয়া তিনি বলিলেন, এইমাত্র শয়তান আমাকে একটি ধোকা দিল। সে আমার মনে এই ধারণা দিল যে, আমি সবচাইতে ভাল (কারণ যে ভাল তাহাকেই ইমাম বানানো হয়)। কাজেই ভবিষ্যতে আমি আর কখনও নামায পড়াইব না।

মাইমূন ইবনে মেহরান (রহঃ) একবার মসজিদে গিয়া দেখিলেন জামাত শেষ হইয়া গিয়াছে, তিনি 'ইন্না লিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিঊন' পড়িলেন আর বলিলেন, এই নামাযের ফযীলত আমার নিকট ইরাকের বাদশাহী হইতেও বেশী প্রিয়। কথিত আছে, এই সকল বুযুর্গানে দ্বীনের কাহারও তকবীরে উলা ফউত হইয়া গেলে তিন দিন পর্যন্ত উহার শোক প্রকাশ করিতেন, আর জামাত ফউত হইয়া গেলে সাত দিন পর্যন্ত শোক প্রকাশ করিতেন। (এহ্ইয়া)

বকর ইবনে আব্দুল্লাহ (রহঃ) বলেন, তুমি যদি তোমার মালিক ও মাওলা পাকের সাথে সরাসরি কথা বলিতে চাও, তবে যখন ইচ্ছা তখনই বলিতে পার। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, ইহা কিরূপে হইতে পারে। তিনি বলিলেন, উত্তমরূপে ওযূ কর অতঃপর নামাযে দাঁড়াইয়া যাও।

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সহিত কথা বলিতে থাকিতেন এবং আমরাও তাহার সহিত কথা বলিতে থাকিতাম ; কিন্তু যখন নামাযের সময় হইয়া যাইত তখন তাঁহার অবস্থা এমন হইত যেন তিনি আমাদেরকে একেবারেই চিনেন না এবং সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর ধ্যানে মশগুল হইয়া যাইতেন।

সাঈদ তান্নোখী (রহঃ) যখন নামাযে দাঁড়াইতেন, তখন ক্রমাগত

তাহার মুখমণ্ডলের উপর চোখের পানি জারী থাকিত।

খালফ ইবনে আইয়ূব (রহঃ)কে কেহ জিজ্ঞাসা করিল, এই মাছিগুলি কি নামাযে আপনাকে বিরক্ত করে না? তিনি বলিলেন, নামাযের জন্য ক্ষতিকর এমন কোন জিনিসের অভ্যাস আমার নাই। অসৎ লোকেরা সরকারের বেত্রাঘাত এইজন্য সহ্য করে যে, লোকেরা তাহাদিগকে ধৈর্যশীল বলিবে এবং উহাকে গর্ব সহকারে বলিয়াও বেড়ায়—আর আমি আমার মালিক ও মাওলা পাকের সামনে দাঁড়াইয়াছি ; এইখানে একটি মাছির কারণে নড়াচড়া করিব।

'বাহ্‌জাতুন্নুফুস' কিতাবে আছে, এক সাহাবী (রাযিঃ) রাত্রে নামায পড়িতেছিলেন, এমন সময় একটি চোর আসিয়া তাঁহার ঘোড়া খুলিয়া লইয়া গেল। লইয়া যাওয়ার সময় তিনি তাহাকে দেখিতেও পাইলেন কিন্তু নামায ছাড়িলেন না। পরে একজন তাহাকে জিজ্ঞাসাও করিলেন যে, চোরকে আপনি ধরিলেন না কেন? তিনি বলিলেন, আমি যে কাজে মশগুল ছিলাম, উহা ঘোড়া হইতে অনেক উত্তম ছিল।

হযরত আলী (রাযিঃ) সম্পর্কে এই কথা প্রসিদ্ধ আছে যে, যুদ্ধের ময়দানে তাঁহার শরীরে তীর বিদ্ধ হইলে নামাযের অবস্থায়ই উহা বাহির করা হইত। একবার তাহার উরুতে একটি তীর বিদ্ধ হইয়াছিল, লোকেরা অনেক চেষ্টা করিয়াও যখন উহা বাহির করিতে পারিল না, তখন তাহারা সকলেই পরামর্শ করিল যে, নামাযের অবস্থায়ই উহা বাহির করা যাইবে। পরে যখন তিনি নফল নামাযে দাঁড়াইলেন এবং সেজদায় গেলেন তখন লোকেরা উহাকে টানিয়া বাহির করিয়া নিল। নামায শেষ করিয়া তিনি আশে–পাশে লোকজনের ভীড় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি আমার তীর বাহির করিতে আসিয়াছ? লোকেরা আরজ করিল, আমরা তো উহা বাহির করিয়া ফেলিয়াছি। তিনি বলিলেন, আমি তো টেরই পাই নাই।

মুসলিম ইবনে ইয়াসার (রহঃ) যখন নামাযে দাঁড়াইতেন, তখন পরিবারের লোকদিগকে বলিয়া দিতেন যে, তোমরা কথাবার্তা বলিতে থাক। কেননা, তোমাদের কথাবার্তা আমি নামাযের মধ্যে শুনিতে পাইব না।

হযরত রবী (রহঃ) বলেন, আমি যখন নামাযে দাঁড়াই তখন এই চিন্তায় বিভোর হইয়া যাই যে, মৃত্যুর পর আমাকে কি কি প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হইবে!

হযরত আমের ইবনে আব্দুল্লাহ (রহঃ) যখন নামাযে দাঁড়াইতেন তখন

লোকজনের কথাবার্তা তাঁহার কানে যাওয়া তো দূরের কথা ঢোলের আওয়াজও তাহার কানে প্রবেশ করিত না। কেহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, নামাযে কি আপনার কোন কিছুর খেয়াল হয়? তিনি বলিলেন, হাঁ, আমার এই খেয়াল হয় যে, একদিন আল্লাহর দরবারে আমাকে দাঁড়াইতে হইবে এবং বেহেশত ও দোযখ এই দুইটির একটিতে অবশ্যই আমাকে যাইতে হইবে। লোকটি আরজ করিল, ইহা জিজ্ঞাসা করি নাই বরং আমার প্রশ্ন হইল, আমাদের কথাবার্তা কি কিছুই আপনি শুনিতে পান না? তিনি বলিলেন, নামাযে তোমাদের কথাবার্তা শুনিতে পাওয়ার চাইতে আমার শরীরে বর্শা বিদ্ধ হওয়া অধিক ভাল। তিনি আরও বলিতেন, আখেরাতের যাবতীয় দৃশ্য যদি এখন আমার চোখের সামনে পেশ করা হয় তবে চোখে দেখিয়াও আমার ঈমান ও একীন বিন্দুমাত্র বাড়িবে না। (কারণ গায়েবের উপর তাহার ঈমান এমনই মজবুত ছিল যেমন সরাসরি দেখার উপর হইয়া থাকে)।

এক বুযুর্গের একটি অঙ্গ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল যাহা কাটিয়া ফেলা ছাড়া উপায় ছিল না। লোকেরা ঠিক করিল নামাযের অবস্থায়ই উহা কাটা সম্ভব হইবে ; তিনি টের পাইবেন না। পরে নামাযের অবস্থায়ই উহা কাটা হইল এবং তিনি মোটেও টের পাইলেন না।

জনৈক বুযুর্গকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, নামাযের মধ্যে কি আপনার কখনও দুনিয়াবী খেয়াল আসে? তিনি বলিলেন, এইরূপ খেয়াল নামাযেও আসে না এবং নামাযের বাহিরেও আসে না।

অপর এক বুযুর্গকেও এই প্রশ্ন করা হইয়াছিল যে, নামাযে তাঁহার অন্য কোন খেয়াল আসে কিনা! তিনি বলিয়াছেন, নামাযের চাইতেও প্রিয় জিনিস কি আছে যাহার খেয়াল নামাযের মধ্যে আসিবে।

'বাহ্‌জাতুন্নুফুস' কিতাবে লেখা আছে, জনৈক ব্যক্তি এক বুযুর্গের সহিত সাক্ষাত করিতে আসিল। বুযুর্গকে যোহরের নামাযে মশগুল দেখিয়া লোকটি বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। যোহরের নামায শেষ করিয়া তিনি নফলে মশগুল হইয়া গেলেন এবং আছর পর্যন্ত নফল পড়িতে থাকিলেন। এদিকে লোকটি অপেক্ষায় বসিয়াই রহিল। তিনি নফল শেষ করিয়া আছরের নামায শুরু করিলেন। আছরের নামায হইতে ফারেগ হইয়াই মাগরিব পর্যন্ত দোয়ায় মশগুল থাকিলেন। অতঃপর মাগরিবের নামায পড়িয়া এশা পর্যন্ত নফলে মশগুল হইয়া গেলেন। এইদিকে আগন্তুক বেচারা অপেক্ষা করিতে থাকিল। এশার নামায পড়িয়া তিনি আবার নফল শুরু করিয়া দিলেন। সকাল পর্যন্ত তিনি এইভাবে নফলেই

মগ্ন রহিলেন। অতঃপর ফজরের নামায আদায় করিয়া আবার যিকির-ওজীফায় মশগুল হইয়া গেলেন। ইতিমধ্যে জায়নামাযে বসা অবস্থায় তাঁহার চোখে একটু তন্দ্রা আসিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গেই তিনি চোখ মলিতে মলিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তওবা-এস্তেগফার করিতে লাগিলেন এবং এই দোয়া পড়িলেন—

اَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ عَيْنٍ لَّا تَشْبَعُ مِنَ النَّوْمِ

"যে-চোখ ঘুমাইয়া কখনও তৃপ্ত হয় না সেই চোখ হইতে আমি আল্লাহর পানাহ চাই।"

এক বুযুর্গের ঘটনা আছে যে, তিনি রাত্রে শুইয়া ঘুমানোর চেষ্টা করিতেন কিন্তু যখন কিছুতেই তাঁহার ঘুম আসিত না, তখন তিনি উঠিয়া নামাযে মশগুল হইয়া যাইতেন আর এই আরজ করিতেন ঃ "হে আল্লাহ! তুমি জান—জাহান্নামের আগুনের ভয় আমার নিদ্রাকে উড়াইয়া দিয়াছে।" এই বলিয়া সকাল পর্যন্ত তিনি নামাযে মশগুল থাকিতেন।

অস্থিরতা ও উৎকণ্ঠায় কিংবা চরম শওক ও আগ্রহে সারা রাত্র জাগিয়া কাটাইয়া দেওয়ার ঘটনাবলী এত অধিক যে, উহা গণনা করা অসম্ভব। কিন্তু আমরা উহার স্বাদ হইতে এত দূরে যে, এই সমস্ত ঘটনার সত্যতা সম্পর্কেই আমাদের মনে সন্দেহ লাগিতে আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এইসব ঘটনা এত অধিক পরিমাণে এবং এত অধিক বর্ণনাকারীর মাধ্যমে বর্ণিত হইয়াছে যে, যদি এইগুলিকে অস্বীকার করা হয় তবে গোটা ইতিহাস শাস্ত্রের উপর হইতেই আস্থা উঠিয়া যায়। কেননা, যে-কোন ঘটনার সত্যতা উহার অধিক বর্ণনার দ্বারাই প্রমাণিত হয়। ইহা ছাড়া সর্বদা আমরা নিজেদের চোখে দেখিতেছি যে, এমন অনেক লোক আছে যাহারা সারা রাত্র দাঁড়াইয়া সিনেমা থিয়েটারে কাটাইয়া দেয় অথচ তাহাদের কোন ক্লান্তি বা নিদ্রা আসে না। তাহা হইলে ইহা কোন্ যুক্তির কথা যে, আমরা পাপকার্যের স্বাদ ও আনন্দকে স্বীকার করা সত্ত্বেও এবাদতের স্বাদ ও আনন্দকে অস্বীকার করি ; অথচ এবাদতের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে শক্তিও দান করা হয়। আসলে আমাদের এই সন্দেহের কারণ কি ইহাই নহে যে, আমরা এই সকল ইশ্‌ক-মহব্বতের স্বাদ সম্পর্কে একেবারেই অপরিচিত। আর একথাও সত্য যে, নাবালেগ বালেগ হওয়ার স্বাদ-আনন্দ সম্পর্কে অজ্ঞই হইয়া থাকে। আল্লাহ তায়ালা যদি আমাদেরকে এই স্বাদ লাভের তওফীক দান করেন তবে উহাই হইবে আমাদের পরম সৌভাগ্য।

আখেরী গুযারিশ
বা
শেষ আবেদন

সুফিয়ায়ে কেরাম লিখিয়াছেন, যেহেতু নামাযের হাকীকত হইল, নিবিড়ভাবে আল্লাহ তায়ালার সান্নিধ্য গ্রহণ ও তাঁহার সহিত কথাবার্তায় মগ্ন হওয়া, কাজেই অন্যমনস্ক ও গাফেল অবস্থায় তাহা হইতেই পারে না। পক্ষান্তরে, অন্যান্য এবাদত গাফলতির সহিতও হইতে পারে। যেমন, যাকাতের হাকীকত হইল মাল খরচ করা ; ইহা স্বয়ং নফসের জন্য এত কষ্টসাধ্য যে, গাফলতির সহিতও যদি কেহ যাকাত আদায় করে তবু ইহা নফসের জন্য কষ্টদায়ক হয়। এমনিভাবে, রোযার হাকীকত হইল, সারাদিন ক্ষুধা তৃষ্ণা সহ্য করা, সহবাসের মজা হইতে বিরত থাকা—এইগুলি নফসকে এমনিতেই কাবু করিয়া ফেলে, অতএব গাফলতির সহিত রোযা রাখিলেও নফসের প্রবলতা ও তীব্রতার উপর ইহার প্রভাব পড়ে।

কিন্তু নামাযের প্রধান অঙ্গ হইল, যিকির ও কুরআন তেলাওয়াত। গাফলতির সাথে হইলে ইহাকে আল্লাহর সহিত নিবিড় সম্পর্ক ও কথোপকথন বলিয়া আখ্যায়িত করা যায় না। বরং ইহা এমনই হইয়া যায় যেমন, জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তি জ্বরের অবস্থায় আবল-তাবল বকাবকি করিতে থাকে অর্থাৎ মনের মধ্যে যেসব কথা থাকে এই সময় তাহার জবান হইতে বাহির হইতে থাকে—ইহাতে তাহার না কোনরূপ কষ্ট হয়, আর না ইহাতে তাহার কোন উপকার হয়। তদ্রূপ নামাযের যেহেতু অভ্যাস হইয়া গিয়াছে তাই মনোযোগ না থাকিলেও অভ্যাস অনুযায়ী চিন্তা-ফিকির ছাড়াই জবান হইতে কিছু শব্দ বাহির হইতে থাকে, যেমন ঘুমন্ত অবস্থায় মানুষের মুখ হইতে বহু কথা এমন বাহির হয় যাহা উপস্থিত শ্রবণকারী শুনিয়াও তাহার সহিত কথা বলা হইতেছে বলিয়া মনে করে না এবং যে বলে তাহারও ইহাতে কোন ফায়দা হয় না। তদ্রূপ আল্লাহ তায়ালাও এমন নামাযের প্রতি কোনরূপ ভ্রূক্ষেপ করেন না, যাহা ইচ্ছা ও এরাদা ছাড়া হইয়া থাকে। অতএব ইহা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, নিজ নিজ শক্তি-সামর্থ অনুযায়ী পূর্ণ মনোযোগ ও এখলাসের সহিত নামায পড়িবে।

কিন্তু ইহাও নেহায়েত জরুরী যে, পূর্ববর্তী বুযুর্গানে দ্বীনের নামায সম্পর্কে যে সকল অবস্থা উল্লেখ করা হইয়াছে, সেইরূপ নামায যদি নাও পড়া যায় তবুও যেকোন অবস্থাতেই নামায অবশ্যই পড়িতে হইবে।

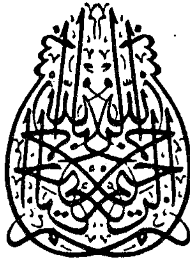
শয়তান মানুষকে এইভাবেও ধোকা দিয়া থাকে যে, মন্দভাবে নামায পড়ার চাইতে না পড়াই ভাল। শয়তানের এই মারাত্মক ধোকা হইতে খুবই সতর্ক থাকিতে হইবে। কেননা, নামায একেবারে না পড়িলে যে শাস্তি পাইতে হইবে উহা খুবই কঠিন। এমনকি অনেক ওলামায়ে কেরাম এইরূপ ব্যক্তি সম্পর্কে কুফরের ফতওয়াও দিয়াছেন যাহারা ইচ্ছাকৃতভাবে নামায ত্যাগ করে। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখ করা হইয়াছে। তবে হক আদায় করিয়া নামায পড়া এবং বুযুর্গদের দেখানো আদর্শ অনুযায়ী নামায পড়ার জন্য জোর চেষ্টা অবশ্যই করিতে হইবে। আল্লাহ তায়ালা মেহেরবাণী করিয়া আমাদিগকে এইরূপ নামায আদায় করার তওফীক দান করুন এবং জীবনে অন্ততঃ একটি নামাযও যেন এইরূপ হইয়া যায় যাহা আল্লাহর দরবারে পেশ করার উপযুক্ত হয়।

পরিশেষে এই বিষয়েও সতর্ক করিয়া দেওয়া জরুরী মনে করি যে, মুহাদ্দিসগণ ফাযায়েল সম্পর্কিত হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে উদারতা ও প্রশস্ততার অবকাশ দিয়া থাকেন, অতএব তাহাদের মতে সনদ ও সূত্রগত সাধারণ দুর্বলতা এই ক্ষেত্রে ধর্তব্য নয়। ইহা ছাড়া সূফিয়ায়ে কেরামের ঘটনাবলী ইতিহাস জাতীয় বিষয়, আর ইতিহাসের মান হাদীসের তুলনায় অনেক কম।

وَمَا تَوْفِيْقِيْ اِلَّا بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا
وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ
اَوْ اَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ،
رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ، وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا اَنْتَ
مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ - وَصَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ
سَيِّدِ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ وَعَلٰٓى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَتْبَاعِهِمْ وَحَمَلَةِ الدِّيْنِ
الْمَتِيْنِ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ -

॥ ॥ ॥

ফাযায়েলে কুরআন



اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ خَلَقَ الْاِنْسَانَ
وَعَلَّمَهُ الْبَيَانَ وَ اَنْزَلَ لَهُ الْقُرْاٰنَ
وَجَعَلَهُ مَوْعِظَةً وَّشِفَاءً وَّهُدًى
وَّرَحْمَةً لِّذَوِی الْاِيْمَانِ لَا رَيْبَ
فِيْهِ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهُ عِوَجًا وَّاَنْزَلَهُ
قَيِّمًا حُجَّةً نُوْرًا لِّذَوِی الْاِيْقَانِ
وَالصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ الْاَتَمَّانِ
الْاَكْمَلَانِ عَلٰى خَيْرِ الْخَلَائِقِ
مِنَ الْاِنْسِ وَ الْجَانِّ الَّذِیْ
نَوَّرَ الْقُلُوْبَ وَ الْقُبُوْرَ نُوْرُهُ وَرَحْمَةً
لِّلْعٰلَمِيْنَ ظُهُوْرُهُ وَعَلٰى اٰلِهٖ
وَصَحْبِهِ الَّذِيْنَ هُمْ نُجُوْمُ الْهِدَايَةِ
وَنَاشِرُو الْفُرْقَانِ وَعَلٰى مَنْ تَبِعَهُمْ
بِالْاِيْمَانِ وَبَعْدُ فَيَقُوْلُ الْمُفْتَقِرُ
اِلٰى رَحْمَةِ رَبِّهِ الْجَلِيْلِ عَبْدُهُ
الْمَدْعُوُّ بِزَكَرِيَّا بْنِ يَحْيٰى بْنِ
اِسْمٰعِيْلَ هٰذِهِ الْعُجَالَةُ اَرْبَعُوْنَةٌ

تمام تعریف اس پاک ذات کے لئے ہے
جس نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو
وضاحت سکھائی اور اس کے لئے وہ
قرآن پاک نازل فرمایا جس کو نصیحت اور
شفا اور ہدایت اور رحمت ایمان والوں
کے لئے بنایا جس میں نہ کوئی شک ہے
اور نہ کسی قسم کی کجی، بلکہ وہ بالکل مستقیم
ہے اور حجت و نور ہے یقین والوں کے
لئے۔ اور کامل و مکمّل درود و سلام اس
بہترین خلائق پر ہو جیو، جس کے نور نے
زندگی میں دلوں کو اور مرنے کے بعد
قبروں کو منوّر فرمادیا اور جس کا ظہور تمام
عالم کے لئے رحمت ہے اور آپ کی اولاد
اور اصحابؓ پر جو ہدایت کے ستارے
ہیں اور کلام پاک کے پھیلانے والے،
نیز ان مومنین پر بھی جو ایمان کے ساتھ ان
کے پیچھے لگنے والے ہیں۔ حمد و صلوٰۃ کے

فِیْ فَضَائِلِ الْقُرْاٰنِ اَلَّفْتُہَا مُمْتَثِلًا
لِاَمْرِ مَنْ اِشَارَتُہٗ حُکْمٌ وَّ
طَاعَتُہٗ غُنْمٌ

بعد اللہ کی رحمت کا محتاج بندہ زکریا بن
یحییٰ بن اسمٰعیل عرض کرتا ہے کہ یہ جلدی
میں لکھے ہوئے چند اوراق "فضائلِ قرآن"
میں ایک چہل حدیث ہے جس کو میں نے ایسے حضرات کے امتثالِ حکم میں جمع
کیا ہے جن کا اشارہ بھی حکم ہے اور ان کی اطاعت ہر طرح مغتنم ہے۔

সমস্ত প্রশংসা ঐ পাক যাত আল্লাহর জন্য, যিনি মানব জাতিকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাদিগকে বয়ান শিক্ষা দিয়াছেন এবং তাহাদের জন্য পবিত্র কুরআন নাযিল করিয়াছেন। যে কুরআনকে তিনি ঈমানদারদের জন্য উপদেশ ও শেফা এবং হেদায়াত ও রহমত বানাইয়াছেন। ইহাতে না কোন সন্দেহ আছে, না কোন প্রকার বক্রতা। বরং ইহা একীনওয়ালাদের জন্য সরল-সঠিক প্রামাণ্য কিতাব ও নূর। অতঃপর পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ দরূদ ও সালাম সৃষ্টির সেরা প্রিয় নবীজীর উপর, যাঁহার নূর দুনিয়ার জীবনে মানুষের আত্মাকে এবং মৃত্যুর পর তাহাদের কবরকে আলোকিত করিয়া দিয়াছে। যাঁহার আগমন ও আবির্ভাব সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমতস্বরূপ। তাঁহার সন্তান-সন্ততি ও সাহাবীগণের উপর শান্তি বর্ষিত হউক, যাহারা হেদায়াতের জন্য নক্ষত্রস্বরূপ এবং কালামে পাকের প্রচারক। আরও শান্তি বর্ষিত হউক ঐ সকল মুমিনের উপর যাহারা ঈমানের সহিত তাহাদের অনুসারী হন।

হামদ ও সালাতের পর আল্লাহ তায়ালার রহমতের ভিখারী আমি বান্দা যাকারিয়া ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে ইসমাঈল আরজ করিতেছি যে, তাড়াহুড়া করিয়া লেখা এই কয়েকটি পৃষ্ঠা ফাযায়েলে কুরআন সম্পর্কে চল্লিশ হাদীসের একটি সংকলন। ইহা আমি এমন এক মহান বুযুর্গের হুকুমে জমা করিয়াছি যাহার ইশারাও আমার জন্য হুকুম স্বরূপ এবং তাঁহার হুকুম মানা আমার জন্য সর্বদিক দিয়াই কল্যাণকর।

হিন্দুস্থানের সাহারানপুরে অবস্থিত মাযাহিরুল উলূম মাদ্রাসার প্রতি আল্লাহ তায়ালার যে সকল খাছ নেয়ামত সর্বদা জারী রহিয়াছে, তন্মধ্যে একটি মাদ্রাসার বাৎসরিক মাহফিল। প্রতি বৎসর মাদ্রাসার সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট শুনাইবার জন্য এই মাহফিল অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই মাহফিলে বক্তা, ওয়ায়েয এবং দেশের বিখ্যাত ব্যক্তিদেরকে জমা করার এত এহ্তেমাম করা হয় না যত বুযুর্গানে দ্বীন ও সমাজে অপরিচিত আল্লাহওয়ালাদেরকে একত্রিত করার এহ্তেমাম করা হয়। যদিও এখন

আর সেই যমানা নাই, যখন হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাছেম ছাহেব নানুতুবী (রহঃ), কুতবুল এরশাদ হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ ছাহেব গাঙ্গোহী (রহঃ)এর শুভাগমন উপস্থিত লোকদের অন্তরসমূহকে আলোকিত করিয়া দিত, কিন্তু সেই দৃশ্য এখনও চোখের আড়াল হইয়া যায় নাই যখন উপরোক্ত মুজাদ্দেদীনে ইসলাম ও হেদায়াতের সূর্য সদৃশ ব্যক্তিদের স্থলাভিষিক্ত হযরত শায়খুল হিন্দ মাহমূদ হাসান (রহঃ), হযরত শাহ আব্দুর রহীম (রহঃ), হযরত মাওলানা খলীল আহমদ (রহঃ) এবং হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) মাদ্রাসার বার্ষিক মাহফিলে তশরীফ আনিয়া মুর্দা অন্তরসমূহকে জীবনী শক্তি দান করিতেন এবং নূরানিয়তের ফোয়ারা জারী করিয়া দিতেন। এইভাবে তাঁহারা আল্লাহর এশ্‌ক ও মহব্বতে তৃষ্ণার্ত অন্তরসমূহকে পরিতৃপ্ত করিতেন।

বর্তমানে মাদ্রাসার মাহফিল যদিও হেদায়াতের এই সকল চন্দ্র হইতেও মাহরূম হইয়া গিয়াছে তবুও তাহাদের সত্যিকার স্থলাভিষিক্ত বুযুর্গানে দ্বীন এখনও জলসায় হাজেরীনদেরকে স্বীয় ফয়েয ও বরকত দ্বারা ভরপুর করিয়া দিয়া থাকেন। যাহারা এই বছর জলসায় শরীক হইয়াছেন তাহারা ইহার সাক্ষী রহিয়াছেন। অন্তরদৃষ্টি সম্পন্ন লোকেরা এই বরকত দেখিতে পান। আমাদের মত অন্তর্দৃষ্টিহীন লোকেরাও অন্তত এতটুকু অবশ্যই উপলব্ধি করিতে পারে যে, নিশ্চয়ই অসাধারণ কিছু একটা রহিয়াছে। মাদ্রাসার সালানা জলসায় শুধু বক্তৃতা ও জোরদার লেকচার শুনিবার উদ্দেশ্য নিয়া যদি কেহ আসে তবে সম্ভবতঃ সে এতটুকু পরিতৃপ্ত হইয়া যাইতে পারিবে না যতটুকু কামিয়াব ও ফয়েজপ্রাপ্ত হইয়া যাইবে আত্মার রোগ-ব্যাধির চিকিৎসাপ্রার্থীগণ।

মাদ্রাসার সালানা জলসা উপলক্ষে এই বৎসর ২৭শে জিলকদ ১৩৪৮ হিজরীর মাহফিলে হযরত শাহ হাফেজ মুহাম্মদ ইয়াসীন সাহেব নাগিনবী (রহঃ) শুভাগমন করিয়া অধমের উপর যে স্নেহ ও মেহেরবানীর বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছেন উহার শুকরিয়া আদায় করিতেও আমি অক্ষম। তিনি হযরত গাঙ্গোহী (রহঃ)এর খলীফা—এই কথা জানার পর তাঁহার উচ্চ গুণাবলী, একাগ্রতা, বুযুর্গী, নূর ও বরকতের বিষয়ে আলোচনার কোন প্রয়োজন থাকে না। তিনি জলসা হইতে বাড়ীতে ফিরিয়া যাওয়ার পর সম্মানজনক পত্র দ্বারা আমাকে এই নির্দেশ দিলেন যে, আমি যেন ফাযায়েলে কুরআন সম্পর্কিত চল্লিশ হাদীস সংকলন করিয়া উহার তরজমা তাঁহার খেদমতে পেশ করি। তিনি ইহাও লিখিয়া দিলেন যে, আমি যদি তাঁহার হুকুম

পালনে অবাধ্যতা করি, তবে তিনি আমার শায়েখের স্থলাভিষিক্ত, পিতৃতুল্য চাচাজান হযরত মাওলানা হাফেজ আলহাজ্জ মৌলভী মুহাম্মদ ইলিয়াস ছাহেব (রহঃ)এর দ্বারা তাঁহার হুকুমকে আরও জোরদার করাইবেন। যাহা হউক, তিনি এই খেদমত আমার মত অধমের দ্বারাই নিতে চাহিলেন। ঘটনাক্রমে এই সম্মানিত পত্রখানি এমন অবস্থায় পৌঁছিল যে, আমি সফরে ছিলাম এবং আমার চাচাজান এখানে আসিয়াছিলেন। আমি সফর হইতে ফিরিয়া আসার পর তিনি গুরুত্ব সহকারে নির্দেশ দান করতঃ পত্রখানি আমার হাওয়ালা করিলেন। ইহার পর আমার না কোন ওজর দেখাইবার অবকাশ রহিল আর না নিজের অযোগ্যতার কথাও পেশ করিবার সুযোগ রহিল। যদিও আমার জন্য হাদীসের কিতাব 'মুওয়াত্তা ইমাম মালেক' এর শরাহ লেখার ব্যস্ততাও একটি শক্তিশালী ওজর ছিল। তথাপি এই মহান হুকুমের গুরুত্বের কারণে উহাকে কিছুদিনের জন্য মুলতবী করিয়া দিয়া আমার দ্বারা যাহা সম্ভব হইয়াছে উহা লিখিয়া তাঁহার খেদমতে পেশ করিতেছি এবং আমার অযোগ্যতার দরুন ইহাতে যে সকল ভুল-ভ্রান্তি হওয়া একান্ত স্বাভাবিক সেইগুলির জন্য ক্ষমা চাহিতেছি।

আমি এই কিতাবখানি কিয়ামতের দিন ঐ সকল লোকের জামাতে শরীক হওয়ার আশায় লিখিয়াছি যাহাদের সম্পর্কে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার উম্মতের জন্য দ্বীনী বিষয়ের উপর চল্লিশটি হাদীস সংরক্ষণ করিবে আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন তাহাকে আলেম হিসাবে উঠাইবেন এবং আমি তাহার জন্য সুপারিশকারী ও সাক্ষী হইব।

হযরত আলকামী (রহঃ) বলেন, 'সংরক্ষণ করা'র অর্থ হইল কোন জিনিসকে একত্র করিয়া ধ্বংস হইতে রক্ষা করা। চাই লেখা ব্যতীত মুখস্থ করিয়া হউক কিংবা লিখিয়া সংরক্ষণ করা হউক যদিও মুখস্থ না থাকে। সুতরাং যদি কেহ কিতাবে লিখিয়া অন্যের নিকট পৌঁছাইয়া দেয়, তবে সেও হাদীসে বর্ণিত সুসংবাদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

মুনাবী (রহঃ) বলেন, "আমার উম্মতের জন্য সংরক্ষণ করিবে" এই কথার অর্থ হইল, উম্মতের নিকট সনদের হাওয়ালা সহ বর্ণনা করা। কেহ কেহ বলিয়াছেন, মুসলমানদের নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়াই উদ্দেশ্য ; যদিও মুখস্থ না থাকে বা অর্থ জানা না থাকে। এমনিভাবে 'চল্লিশ হাদীস' কথাটিও ব্যাপক। অর্থাৎ সবগুলি হাদীস সহীহ বা হাসান পর্যায়েরও হইতে পারে অথবা এমন মামুলী পর্যায়ের দুর্বল হাদীসও হইতে পারে যেগুলির

উপর ফাযায়েলের ক্ষেত্রে আমল করা জায়েয আছে।

আল্লাহু আকবার ; ইসলামের মধ্যেও কত সুযোগ সুবিধা রহিয়াছে। আরও আশ্চর্যের বিষয় হইল, আমাদের ওলামায়ে কেরাম কত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয় স্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা আমাকেও এবং আপনাদেরকেও পরিপূর্ণ ইসলাম নসীব করুন।

এখানে একটি জরুরী বিষয়ের প্রতি সতর্ক করিয়া দেওয়া একান্ত আবশ্যক। তাহা হইল এই যে, আমি হাদীসসমূহের হাওয়ালা দেওয়ার ব্যাপারে মিশকাত, মিরকাত, তানকীহুর রেওয়ায়াত, শরহে এহয়াউল উলূম ও আল্লামা মুনযিরীর তারগীব গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়াছি এবং এইগুলি হইতে হাদীস অধিক পরিমাণে গ্রহণ করিয়াছি। তাই এইগুলির হাওয়ালা দেওয়ার প্রয়োজন মনে করি নাই। তবে এইগুলি ব্যতীত অন্য কোন কিতাব হইতে যাহা গ্রহণ করিয়াছি উহার হাওয়ালা উল্লেখ করিয়া দিয়াছি।

তেলাওয়াতকারীর জন্য তেলাওয়াতের সময় উহার আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখা জরুরী। অতএব উদ্দেশ্যের পূর্বে কুরআন মজিদ পাঠের কিছু আদব লিখিয়া দেওয়া সঙ্গত মনে হইতেছে। কেননা—

بے ادب محروم گشت از فضل رب

'বেআদব আল্লাহর মেহেরবানী হইতে বঞ্চিত থাকে।'

সংক্ষিপ্তভাবে এই আদবগুলির সারকথা হইল, কালামুল্লাহ শরীফ মাবুদের কালাম, মাহবুব ও প্রিয়ের বাণী।

প্রেম ও ভালবাসার সহিত যাহাদের কিছু মাত্রও সম্পর্ক রহিয়াছে তাহারা জানেন যে, প্রেমিকের নিকট মাশুকের পত্র, তাহার কথা ও লেখার কি পরিমাণ মূল্য ও গুরুত্ব হইয়া থাকে ; উহার সহিত যে প্রেম ও প্রণয়ের ব্যবহার হইয়া থাকে এবং হওয়াও উচিত তাহা সকল নিয়ম-কানুনের উর্ধ্বে।

জনৈক কবি বলিয়াছেন—

محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی

অর্থ ঃ মহব্বত নিজেই তোমাকে মহব্বতের কায়দা-কানুন শিখাইয়া দিবে।

এই সময় যদি আল্লাহর অপরূপ সৌন্দর্য এবং সীমাহীন নেয়ামতের কল্পনা হৃদয়ে জাগিয়া উঠে তবে অন্তরে মহব্বত ও ভালবাসার ঢেউ

উঠিবে। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও ধ্যান করিতে হইবে যে, ইহা আহকামুল হাকেমীনের কালাম, রাজাধিরাজের ফরমান এবং এমন মহাপ্রতাপ ও পরাক্রমশালী বাদশাহের আইন যাহার সমকক্ষতার দাবী দুনিয়ার বড় হইতে বড় কাহারো দ্বারা সম্ভব হইয়াছে, না হইতে পারে।

যাহারা কখনও শাহী দরবারে যাওয়ার সুযোগ পাইয়াছে তাহারা বাস্তব অভিজ্ঞতার দ্বারা আর যাহাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা নাই তাহারা আন্দাজ-অনুমানের দ্বারা বুঝিতে পারেন যে, শাহী ফরমান মানুষের অন্তরে কতটুকু প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। কালামে ইলাহী একদিকে যেমন প্রিয়তম মাহবুবের কালাম অপরদিকে উহা সমগ্র জগতের শাসনকর্তা মহান আল্লাহ তায়ালার ফরমান। তাই উহার ব্যাপারে এই উভয় প্রকার আদব রক্ষা করিয়া চলা জরুরী।

হযরত ইকরিমা (রাযিঃ) যখন তেলাওয়াতের জন্য কালামে পাক খুলিতেন, তখন বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া যাইতেন এবং তাহার মুখ হইতে উচ্চারিত হইতে থাকিত—

هٰذَا كَلَامُ رَبِّىْ، هٰذَا كَلَامُ رَبِّىْ

‘ইহা আমার রবের কালাম, ইহা আমার রবের কালাম।’

উপরোক্ত আদবসমূহ মাশায়েখগণ কর্তৃক লিখিত আদবসমূহের সংক্ষিপ্ত সার। এইগুলির কিছুটা ব্যাখ্যাও আমি পাঠকদের খেদমতে পেশ করিতেছি। যাহার সারসংক্ষেপ হইল এই যে, বান্দা চাকর ও ভৃত্য হিসাবে নয় বরং বান্দা ও গোলাম হিসাবে দাতা, দয়ালু, মনিব ও মালিকের কালাম তেলাওয়াত করিবে।

সুফিয়ায়ে কেরাম লিখিয়াছেন, যে ব্যক্তি কুরআন তেলাওয়াতের আদবসমূহ পালন করিতে নিজেকে অক্ষম মনে করিতে থাকিবে, সে ক্রমান্বয়ে আল্লাহর নৈকট্য ও সান্নিধ্যের ধাপে উন্নতি লাভ করিতে থাকিবে। আর যে ব্যক্তি নিজেকে পরিতুষ্টি ও আত্মতৃপ্তির দৃষ্টিতে দেখিবে, সে উন্নতির পথ হইতে দূরে থাকিবে।

তেলাওয়াতের আদবসমূহ

মেসওয়াক ও ওযূ করিয়া কোন নির্জন স্থানে অত্যন্ত গাম্ভীর্য ও বিনয়ের সহিত কেবলামুখী হইয়া বসিবে এবং অত্যন্ত ধ্যান ও খুশুর সহিত উপস্থিত সময়ের উপযোগী এমন ভাবপূর্ণ ভঙ্গিতে তেলাওয়াত করিবে যেন স্বয়ং মহান রাব্বুল আলামীনকে কালামে পাক শোনান হইতেছে।

তেলাওয়াতকারী কুরআনের অর্থ বুঝিলে গভীর চিন্তা-ফিকিরের সহিত রহমতের আয়াতসমূহে গোনাহ-মাফী ও রহমত লাভের দোয়া করিবে। আর আজাব ও ভয়ের আয়াতসমূহে আল্লাহর আশ্রয় চাহিবে। কেননা তিনি ব্যতীত আর কেহই সাহায্যকারী নাই। আল্লাহর পবিত্রতা সম্পর্কীয় আয়াত তেলাওয়াত কালে সুবহানাল্লাহ বলিবে। তেলাওয়াত করার সময় আপনা আপনি কান্না না আসিলে কান্নার ভাব করিবে। (কবির ভাষায়—)

وَاَلَذُّ حَالَاتِ الْغَرَامِ لِمُغْرَمٍ　　شَكْوَى الْهَوٰى بِالْمَدْمَعِ الْمُهْرَاقِ

অর্থ ঃ কোন আশেকের জন্য সবচাইতে আনন্দের অবস্থা হইল, সে তাহার মাশুকের নিকট চক্ষু হইতে অশ্রু বর্ষণ করতঃ অভিযোগ পেশ করিতেছে!

মুখস্থ করার উদ্দেশ্যে না পড়িলে তেলাওয়াতের সময় তাড়াহুড়া করিবে না। কুরআন শরীফকে রেহাল, বালিশ বা কোন উঁচু জায়গায় রাখিবে। তেলাওয়াতের সময় কাহারও সাথে কথা-বার্তা বলিবে না, বিশেষ কোন প্রয়োজন দেখা দিলে কালামে পাক বন্ধ করিয়া কথা বলিবে। অতঃপর আউযুবিল্লাহ পড়িয়া পুনরায় শুরু করিবে। যদি উপস্থিত লোকেরা নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত থাকে তবে আস্তে আস্তে পড়া উত্তম। নতুবা জোরে পড়া ভাল। মাশায়েখগণ পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করার ছয়টি জাহেরী আদব ও ছয়টি বাতেনী আদব বর্ণনা করিয়াছেন।

জাহেরী আদব ৬টি ঃ

১। গভীর শ্রদ্ধা ও এহ্‌তেরামের সহিত ওযূসহ কেবলামুখী হইয়া বসিবে।

২। পড়ার সময় তাড়াতাড়ি না করিয়া তারতীল ও তাজবীদের সহিত পড়িবে।

৩। উপরে উল্লেখিত নিয়মে রহমত ও আজাবের আয়াতসমূহের হক আদায় করিবে।

৪। ভান করিয়া হইলেও কান্নার চেষ্টা করিবে।

৫। রিয়া বা লোক-দেখানোর ভয় হইলে বা অন্য কোন মুসলমানের কষ্ট বা অসুবিধা হওয়ার আশঙ্কা হইলে চুপে চুপে পড়িবে, নতুবা জোরে পড়িবে।

৬। মিষ্ট স্বরে পড়িবে। কেননা কালামে পাক মিষ্ট স্বরে পড়িবার জন্য বহু হাদীসে তাকীদ আসিয়াছে।

বাতেনী আদব ৬টি ঃ

১। কালামে পাকের আজমত ও মর্যাদা অন্তরে রাখিবে যে, ইহা কত উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন কালাম!

২। যে মহান আল্লাহ তায়ালার এই কালাম, তাহার উচ্চ শান, মহত্ত্ব ও বড়ত্ব অন্তরে রাখিবে।

৩। অন্তরকে ওয়াস্ওয়াসা ও বাজে খেয়াল হইতে পবিত্র রাখিবে।

৪। অর্থের প্রতি চিন্তা করিবে এবং স্বাদ লইয়া পড়িবে।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার সারারাত্র এই আয়াত পড়িয়া কাটাইয়া দিয়াছেন—

إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر مغفرت فرمادے تو عزت و حکمت والا ہے۔

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আপনি যদি তাহাদিগকে শাস্তি দেন তবে তাহারা তো আপনারই বান্দা। আর যদি মাফ করিয়া দেন তবে আপনি পরাক্রমশালী ও হিকমতওয়ালা। (সূরা মায়িদাহ, আয়াত ঃ ১১৮)

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রাযিঃ) একরাত্রে এই আয়াত পড়িতে পড়িতে সকাল করিয়া দিয়াছেন—

وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ○

او مجرمو! آج قیامت کے دن فرماں برداروں سے الگ ہو جاؤ۔

'হে অপরাধীদল! আজ (কিয়ামতের দিন) তোমরা অনুগত বান্দাদের হইতে পৃথক হইয়া যাও।' (সূরা ইয়াসীন, আয়াত ঃ ৫৯)

৫। যখন যে আয়াত তেলাওয়াত করিবে তখন অন্তরকে সেই আয়াতের অধীন ও অনুগত করিয়া লইবে। যেমন, রহমতের আয়াত তেলাওয়াত করিবার সময় অন্তর আনন্দে ভরিয়া উঠিবে। আজাবের আয়াত তেলাওয়াত করিবার সময় অন্তর কাঁপিয়া উঠিবে।

৬। উভয় কানকে এমন নিবিষ্ট করিয়া রাখিবে যেন আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং কথা বলিতেছেন আর তেলাওয়াতকারী নিজ কানে শুনিতেছে। আল্লাহ তায়ালা দয়া করিয়া আমাকে ও আপনাদিগকে এই আদবসমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তেলাওয়াত করার তওফীক দান করুন, আমীন।

মাসআলা ঃ নামায আদায় করা যায় এই পরিমাণ কুরআন শরীফ মুখস্থ করা প্রত্যেকের উপর ফরজ। সমস্ত কুরআন শরীফ মুখস্থ করা ফরযে

কেফায়া। আল্লাহ না করুন যদি একজন হাফেজও না থাকে তবে সমস্ত মুসলমান গোনাহগার হইবে। আল্লামা যরকাশী (রহঃ) হইতে মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) নকল করিয়াছেন যে, কোন শহর বা গ্রামে একজন লোকও কুরআন পড়নেওয়ালা না থাকিলে সকলেই গোনাহগার হইবে। বর্তমান গুমরাহী ও জেহালতের যুগে যেখানে আমাদের মুসলমানদের মধ্যে বহু দ্বীনি বিষয়ে গুমরাহী ছড়াইতেছে সেখানে ইহাও সাধারণভাবে ছড়াইয়া গিয়াছে যে, কুরআন শরীফ হিফয করাকে বেকার মনে করা হইতেছে। ইহার শব্দসমূহ বারবার আওড়ানোকে নির্বুদ্ধিতা বলা হইতেছে। ইহার শব্দ মুখস্থ করাকে দেমাগ ক্ষয় ও সময়ের অপচয় বলা হইতেছে। আমাদের বদদ্বীনীর মহামারী যদি এই একটি মাত্র হইত, তবে না হয় উহা সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু লেখা যাইত। কিন্তু যেক্ষেত্রে আমাদের প্রতিটি কাজ-কর্ম এককেটি মারাত্মক ব্যাধি এবং প্রতিটি খেয়াল ও চিন্তা-ভাবনা বাতেলের দিকেই টানিয়া লইয়া যাইতেছে, সেই ক্ষেত্রে কোন্ কোন্ জিনিসের উপর কাঁদিবেন আর কোন্ কোন্ বিষয়েরই বা অভিযোগ করিবেন। সমস্ত অভিযোগ আল্লাহর দরবারে করিতেছি এবং তাহারই সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি।

ফাযায়েলে কুরআন

চল্লিশ হাদীস

(١) عَنْ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُكُمْ مَّنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ.

حضرت عثمانؓ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن شریف کو سیکھے اور سکھائے۔

(رواه البخاری وابوداؤد والترمذی والنسائی وابن ماجة هذا فی الترغیب وعزاه الی مسلم ایضًا لکن حکی الحافظ فی الفتح عن ابی العلاء أنّ مسلمًا سکت عنه)

(১) হযরত ওসমান (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত ; হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সর্বোত্তম যে নিজে কুরআন শরীফ শিখে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়।

(তারগীব ঃ বুখারী, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ)

অধিকাংশ কিতাবে এই রেওয়ায়াতটি 'ওয়াও' (অর্থাৎ, এবং)এর সহিত বর্ণিত হইয়াছে, উপরে হাদীসের এই তরজমাই লেখা হইয়াছে। ইহাতে সর্বোত্তম হওয়ার ফযীলত ঐ ব্যক্তির জন্য হয়, যে কালামে পাক নিজে শিক্ষা করে অতঃপর অন্যকেও শিক্ষা দেয়। কিন্তু কোন কোন কিতাবে এই রেওয়ায়েত 'আও' (অর্থাৎ, অথবা)এর সহিত বর্ণিত হইয়াছে। এই অবস্থায় শ্রেষ্ঠত্ব এবং ফযীলত ব্যাপক হইবে। অর্থাৎ নিজে শিক্ষা করে অথবা অন্যকে শিক্ষা দেয় উভয়ের জন্য পৃথকভাবে সর্বোত্তম হওয়ার ফযীলত রহিয়াছে।

আল্লাহ পাকের কালাম যেহেতু দ্বীনের ভিত্তি ; ইহার স্থায়িত্ব এবং প্রচারের উপরই দ্বীনের অস্তিত্ব নির্ভর করে, কাজেই উহা শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়ার বিষয়টি যে সর্বোত্তম হইবে উহা কাহারো ব্যাখ্যা করিয়া বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে এই শিক্ষার বিভিন্ন প্রকার হইতে পারে। সর্বোচ্চ স্তর হইল অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ শিক্ষা করা। সর্বনিম্ন হইল শুধু শব্দ পড়া শিক্ষা করা। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপর একটি এরশাদও এই হাদীসকে সমর্থন করে। যাহা হযরত সাঈদ ইবনে

সুলাইম (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, যে ব্যক্তি কুরআন শরীফ শিক্ষালাভ করিয়া অন্য শিক্ষায় শিক্ষিত কোন ব্যক্তিকে নিজের চাইতে উত্তম মনে করিল, সে যেন আল্লাহ পাকের দেওয়া কুরআনের নেয়ামতকে অবমাননা করিল। আর ইহা স্পষ্ট কথা যে, যখন আল্লাহর কালাম সমস্ত কালাম হইতে শ্রেষ্ঠ, তখন উহা শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়া নিঃসন্দেহে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হওয়াই উচিত। এই বিষয়ে পৃথকভাবে সামনে হাদীস আসিতেছে।

মোল্লা আলী কারী (রহঃ) অপর একটি হাদীস হইতে নকল করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কালামে পাক হাসিল করিল, সে যেন নিজের কপালে নবুওয়াতের এলেম জমা করিয়া নিল।

হযরত সাহ্ল তুস্তরী (রহঃ) বলেন, আল্লাহ তায়ালার প্রতি মহব্বতের আলামত হইল, অন্তরে তাহার কালামে পাকের প্রতি মহব্বত হওয়া।

কিয়ামতের ভয়ঙ্কর দিনে যাহারা আরশের ছায়ার নীচে স্থান পাইবে, তাহাদের তালিকায় 'শরহে এহ্য়া' কিতাবে ঐ সকল লোককেও উল্লেখ করা হইয়াছে যাহারা মুসলমানদের ছেলেমেয়েদেরকে কুরআন শরীফ শিক্ষা দেয়। এমনিভাবে ঐ সকল লোককেও তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে যাহারা বাল্যকালে কুরআন শরীফ শিক্ষা করে এবং বড় হইলে কুরআন তেলাওয়াতের এহ্তেমাম করে।

(٢) عَنْ اَبِیْ سَعِیْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُوْلُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالٰی مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْاٰنُ عَنْ ذِکْرِیْ وَمَسْئَلَتِیْ اَعْطَیْتُهٗ اَفْضَلَ مَا اُعْطِی السَّائِلِیْنَ وَ فَضْلُ کَلَامِ اللّٰهِ عَلٰی سَائِرِ الْکَلَامِ کَفَضْلِ اللّٰهِ عَلٰی خَلْقِهٖ.

ابوسعیدؓ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ حق سبحانہٗ وتقدس کا یہ فرمان ہے کہ جس شخص کو قرآن شریف کی مشغولی کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی میں اس کو سب دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ شانہٗ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسی کہ خود حق تعالیٰ شانہٗ کو تمام مخلوق پر۔

(رواہ الترمذی والدارمی والبیہقی فی الشعب)

(২) হযরত আবূ সাঈদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত ঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা ফরমান, যে ব্যক্তি কুরআন শরীফে মশগুল থাকার কারণে যিকির করার ও দোয়া করার অবসর পায় না, তাহাকে আমি সকল দোয়া করনেওয়ালাদের চাইতে বেশী

দিয়া থাকি। আর আল্লাহ তায়ালার কালামের মর্যাদা সমস্ত কালামের উপর এইরূপ, যেরূপ স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার মর্যাদা সমস্ত মখলুকের উপর। (তিরমিযী, দারেমী, বাইহাকী ঃ শুআব)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কুরআন শরীফ মুখস্থ করিবার বা জানিবার ও বুঝিবার ব্যাপারে এইরূপ ব্যস্ত থাকে যে, অন্য কোন যিকির-আযকার ও দোয়া করিবার অবসর পায় না, আমি তাহাকে দোয়া করনেওয়ালাদের চাইতেও উত্তম বস্তু দান করিব। দুনিয়ার সাধারণ নিয়ম হইল, যখন কোন লোক মিষ্টিদ্রব্য ইত্যাদি বিতরণ করিতে থাকে এবং মিষ্টি গ্রহণকারীদের কোন একজন যদি এই বিতরণকারীর কাজে মশগুল থাকে আর এই কারণে সে আসিতে না পারে, তবে অবশ্যই তাহার অংশ আগেই আলাদা করিয়া রাখা হয়। অপর এক হাদীসে বলা হইয়াছে যে, আমি তাহাকে শোকরগুযার বান্দার সওয়াব হইতেও উত্তম সওয়াব দান করিব।

(٣) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِی الصُّفَّةِ فَقَالَ اَیُّکُمْ یُحِبُّ اَنْ یَّغْدُوَ کُلَّ یَوْمٍ اِلٰی بُطْحَانَ اَوِ الْعَقِیْقِ فَیَاْتِیْ بِنَاقَتَیْنِ کَوْمَاوَیْنِ فِیْ غَیْرِ اِثْمٍ وَّلَا قَطِیْعَةِ رَحِمٍ فَقُلْنَا یَارَسُوْلَ اللّٰهِ کُلُّنَا نُحِبُّ ذٰلِكَ قَالَ اَفَلَا یَغْدُوْ اَحَدُکُمْ اِلَی الْمَسْجِدِ فَیَعْلَمُ اَوْ یَقْرَاُ اٰیَتَیْنِ مِنْ کِتَابِ اللّٰهِ خَیْرٌ لَّهٗ مِنْ نَّاقَتَیْنِ وَثَلٰثٌ خَیْرٌ لَّهٗ مِنْ ثَلٰثٍ وَّاَرْبَعٌ خَیْرٌ لَّهٗ مِنْ اَرْبَعٍ وَّمِنْ اَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْاِبِلِ (رواہ مسلم وابوداؤد)

عقبہ بن عامرؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ہم لوگ صفہ میں بیٹھے تھے۔ آپؐ نے فرمایا کہ تم میں سے کون شخص اس کو پسند کرتا ہے کہ علی الصبح بازار بطحان یا عقیق میں جاوے اور دو اونٹنیاں عمدہ سے عمدہ بلا کسی قسم کے گناہ اور قطع رحمی کے پکڑ لائے۔ صحابہؓ نے عرض کیا کہ اس کو تو ہم میں سے ہر شخص پسند کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں جاکر دو آیتوں کا پڑھنا یا پڑھا دینا دو اونٹنیوں سے اور تین آیات کا تین اونٹنیوں سے اسی طرح چار کا چار سے افضل ہے اور ان کے برابر اونٹوں سے افضل ہے۔

(৩) হযরত উকবা ইবনে আমের (রাযিঃ) বলেন, আমরা মসজিদে নববীর ছুফ্ফায় বসা ছিলাম। এমন সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তশরীক আনিলেন এবং বলিলেন, তোমাদের মধ্যে কে ইহা পছন্দ করে যে, সকাল বেলা বুতহান বা আকীক নামক বাজারে যাইয়া

কোন রকম গোনাহ ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন না করিয়া দুইটি অতি উত্তম উটনী লইয়া আসিবে? সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইহা তো আমাদের সকলেই পছন্দ করিবে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, মসজিদে গিয়া দুইটি আয়াত পড়া বা দুইটি আয়াত শিক্ষা দেওয়া দুইটি উটনী হইতে এবং তিনটি আয়াত তিনটি উটনী হইতে এমনিভাবে চারটি আয়াত চারটি উটনী হইতে উত্তম এবং ঐগুলির সমপরিমাণ উট হইতে উত্তম। (মুসলিম, আবূ দাউদ)

ছুফ্‌ফাহ্ মসজিদে নববীর একটি বিশেষ চালাঘরের নাম। যাহা গরীব মুহাজিরগণের বসিবার স্থান ছিল। আসহাবে ছুফ্‌ফার সংখ্যা বিভিন্ন সময়ে কম বেশী হইতে থাকিত। আল্লামা সূয়ূতী (রহঃ) একশত একজনের নাম উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাহাদের নামের উপর একটি আলাদা কিতাব লিখিয়াছেন। বুতহান ও আকীক মদীনা তাইয়্যেবার নিকটবর্তী দুইটি জায়গার নাম, যেখানে উটের বাজার বসিত। আরবদের নিকট উট অত্যন্ত প্রিয়বস্তু ছিল। বিশেষতঃ উচ্চ কুঁজবিশিষ্ট উট খুবই প্রিয় ছিল।

'কোন রকম গোনাহ ছাড়া' কথাটির অর্থ হইল, বিনা পরিশ্রমে কোন বস্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয়ত বা কাহারো নিকট হইতে ছিনতাই করিয়া লওয়া হয়, অথবা ত্যাজ্য সম্পত্তি ইত্যাদিতে কোন আত্মীয়-স্বজনের মাল আত্মসাৎ করা হয়,নতুবা কাহারো মাল চুরি করিয়া লওয়া হয়। এই জন্য হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সবগুলি পন্থা বাদ দিয়া বলিয়াছেন যে, সম্পূর্ণ বিনা পরিশ্রমে এবং কোনরূপ অন্যায় ব্যতীত উট হাসিল করা যত পছন্দনীয়, উহার চেয়েও বেশী পছন্দনীয় ও উত্তম হইল কয়েকটি আয়াত হাসিল করিয়া নেওয়া। ইহা একটি বাস্তব সত্য যে, দুই-একটি উট তো দূরের কথা ; কেহ সমগ্র দুনিয়ার বাদশাহী পাইলেই কি? বাদশাহীও যদি কেহ পাইয়া যায় তবে তাহাতেই বা কি? আজ না হয় কাল মৃত্যু উহা হইতে জোরপূর্বক পৃথক করিয়া দিবে। কিন্তু একটি আয়াতের সওয়াব চিরকাল তাহার সঙ্গী হইয়া থাকিবে। কাহাকেও আপনি একটি টাকা দান করিলে সে কত আনন্দিত হইবে! পক্ষান্তরে তাহার নিকট এক হাজার টাকা রাখিয়া যদি বলেন যে, এইগুলি তোমার নিকট রাখ, একটু পরেই আমি আসিয়া নিয়া যাইব, ইহাতে সে বিন্দুমাত্রও আনন্দিত হইবে না। কারণ ইহাতে আমানতের বোঝা বহন ছাড়া তাহার কোন লাভ নাই। প্রকৃতপক্ষে এই হাদীস শরীফে স্থায়ী এবং অস্থায়ী বস্তুর পরস্পর তুলনা দ্বারা সতর্ক করিয়া দেওয়াও উদ্দেশ্য। মানুষ যেন নিজের চাল-চলন ও কাজকর্মের উপর গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখে যে, আমি

কি ক্ষণস্থায়ী বস্তুর জন্য মূল্যবান জীবন ধ্বংস করিতেছি, নাকি স্থায়ী বস্তুর জন্য। আর আফসোস ঐ সময়ের উপর যাহা দ্বারা চিরস্থায়ী বিপদ কামাই করিতেছি।

'উহার সমপরিমাণ উট হইতে উত্তম' হাদীসের এই শেষ বাক্যটির তিনটি অর্থ হইতে পারে—

(এক) চার সংখ্যা পর্যন্ত বিস্তারিত বলিয়া দিয়াছেন এবং চারের উপরের সংখ্যাগুলিকে সংক্ষেপে বলিয়া দিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি যত আয়াত পড়িবে উহা ততসংখ্যক উটের চেয়ে উত্তম হইবে। এই ব্যাখ্যা অনুসারে উট বলিতে উট ও উটনী উভয়কে বুঝানো হইয়াছে এবং চারের অধিক সংখ্যা সম্পর্কে বলা হইয়াছে। কেননা, চার পর্যন্ত তো স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

(দুই) পূর্বোল্লিখিত সংখ্যাই বলা হইয়াছে। অর্থাৎ রুচির তারতম্যের কারণে কেহ উটনী পছন্দ করে আবার কেহ উট পছন্দ করে। তাই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বাক্যের মধ্যে ইহা বলিয়া দিলেন যে, প্রতিটি আয়াত যেমন একটি উটনী হইতে উত্তম, তেমনি যদি কেহ উট পছন্দ করে তবে একটি আয়াত একটি উট হইতেও উত্তম হইবে।

(তিন) পূর্বোল্লিখিত সংখ্যাই বর্ণনা করা হইয়াছে, চারের অধিক সংখ্যা সম্পর্কে নয়। তবে দ্বিতীয় অর্থে যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে যে, একটি উটনী অথবা একটি উট হইতে উত্তম এরূপ নহে, বরং সমষ্টি বুঝানো উদ্দেশ্য অর্থাৎ, একটি আয়াত একটি উট ও উটনী উভয়ের সমষ্টি হইতে উত্তম, এইরূপে প্রতিটি আয়াত নিজের সংখ্যা অনুযায়ী উট ও উটনী উভয়ের সমষ্টি হইতে উত্তম। ইহাতে প্রতি আয়াতের মোকাবিলা যেন এক জোড়ার সহিত করা হইল। আমার আব্বাজান (রহঃ) এই অর্থকেই পছন্দ করিয়াছেন। কারণ, ইহাতে অধিক ফযীলত বুঝা যায়। যদিও ইহার অর্থ এই নয় যে, একটি বা দুইটি উট একটি আয়াতের সওয়াবের সমতুল্য হইতে পারে। মূলতঃ এইগুলি শুধুমাত্র উদাহরণ স্বরূপ বলা হইয়াছে। আমি আগেই লিখিয়াছি যে, এক আয়াতের সওয়াব যাহা চিরস্থায়ী এবং চিরকাল বাকী থাকিবে তাহা সারা দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী বাদশাহী হইতেও শ্রেষ্ঠ ও উত্তম।

মোল্লা আলী কারী (রহঃ) লিখিয়াছেন, জনৈক বুযুর্গের কয়েকজন ব্যবসায়ী বন্ধু তাহার নিকট দরখাস্ত করিল যে, জাহাজ হইতে নামিয়া আপনি জিদ্দায় অবস্থান করিলে আপনার বরকতে আমাদের ব্যবসায়ে লাভ হইবে। তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল ব্যবসার লভ্যাংশ দ্বারা উক্ত বুযুর্গের

কয়েকজন খাদেমকে কিছু ফায়দা পৌছানো। প্রথমতঃ বুযুর্গ ইহাতে অসম্মতি জানান। কিন্তু তাহারা অধিক পীড়াপীড়ি করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের ব্যবসার মালে সর্বাধিক কি পরিমাণ লাভ হয়? তাহারা বলিল, উহা বিভিন্ন রকম হইয়া থাকে ; বেশীর চেয়ে বেশী দ্বিগুণ হইয়া যায়। বুযুর্গ বলিলেন, এই সামান্য লাভের জন্য তোমরা এত কষ্ট করিয়া থাক, এই নগণ্য জিনিসের জন্য আমরা হরম শরীফের নামায কিভাবে ছাড়িয়া দিব, যেখানে একের বদলে এক লক্ষ সওয়াব পাওয়া যায়। বাস্তবিকই মুসলমানদের চিন্তা করিয়া দেখিবার বিষয়, তাহারা সামান্য দুনিয়াবী স্বার্থের জন্য কত বড় দ্বীনি স্বার্থ ত্যাগ করিয়া দেয়।

(৪) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاهِرُ بِالْقُرْاٰنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِيْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيْهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهٗ اَجْرَانِ۔ (رواه البخاري ومسلم وابو داؤد والترمذي والنسائي وابن ماجة)

حضرت عائشہؓ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ قرآن کا ماہر اُن ملائکہ کے ساتھ ہے جو میر منشی ہیں اور نیک کار ہیں اور جو شخص قرآن شریف کو اٹکتا ہوا پڑھتا ہے اور اس میں دقت اُٹھاتا ہے اس کو دوہرا اجر ہے۔

(৪) হযরত আয়েশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত ঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কুরআনের পারদর্শী ব্যক্তি ঐ সকল ফেরেশতাদের দলভুক্ত হইবে যাহারা লেখার কাজে নিয়োজিত এবং নেককার। আর যে ব্যক্তি কষ্ট করিয়া ঠেকিয়া ঠেকিয়া কুরআন শরীফ পড়ে সে দ্বিগুণ সওয়াব পাইবে।

(বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

কুরআন শরীফে পারদর্শী ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যে ভালভাবে কুরআন শরীফ মুখস্থ করিয়াছে এবং বেশী বেশী তেলাওয়াত করিয়া থাকে। আর যদি অর্থ ও মর্ম বুঝিয়া পড়ে তবে তো আর কথাই নাই। ফেরেশতাদের দলভুক্ত হওয়ার অর্থ হইল, ফেরেশতাও কুরআন শরীফ লওহে মাহফূজ হইতে নকল করিয়া থাকেন আর এই ব্যক্তিও কুরআনের নকলকারী এবং মানুষের নিকট কুরআন পৌছাইয়া থাকে। অতএব উভয়েই যেন একই কাজে নিয়োজিত। অথবা উহার অর্থ এইরূপও হইতে পারে যে, হাশরের ময়দানে তাহারা ফেরেশতাদের সহিত মিলিত হইবে। ঠেকিয়া ঠেকিয়া পাঠকারীকে দ্বিগুণ সওয়াব দেওয়া হইবে—এক সওয়াব তেলাওয়াতের

জন্য আর এক সওয়াব বার বার ঠেকিয়া ঠেকিয়া কষ্ট করিয়া পড়িবার জন্য। কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে, এই ব্যক্তি পারদর্শী ব্যক্তি হইতে আগে বাড়িয়া যাইবে। পারদর্শী ব্যক্তির জন্য যে ফযীলত বলা হইয়াছে তাহা ইহা হইতে অনেক বেশী। কারণ তাহাদেরকে খাছ ফেরেশতাদের দলভুক্ত করা হইয়াছে। বরং উদ্দেশ্য এই যে, ঠেকিয়া ঠেকিয়া পড়ার কারণে যে কষ্ট হয় উহার সওয়াব সে আলাদা পাইবে। অতএব এই ওজরের কারণে কাহারো পক্ষে কুরআন শরীফের তেলাওয়াত ছাড়িয়া দেওয়া উচিত হইবে না।

মোল্লা আলী কারী (রহঃ) তাবারানী ও বায়হাকী নামক দুই কিতাব হইতে নকল করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি কুরআন শরীফ পড়ে কিন্তু ইয়াদ থাকে না, সেই ব্যক্তির জন্য দ্বিগুণ সওয়াব রহিয়াছে। আর যে ব্যক্তি কুরআন শরীফ মুখস্থ করিবার আকাঙ্খা করিতে থাকে কিন্তু তাহার মুখস্থ করিবার শক্তি নাই এবং সে পড়াও ছাড়িয়া দেয় না, আল্লাহ তায়ালা হাফেজদের সঙ্গেই তাহার হাশর করিবেন।

(৫) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَسَدَ اِلَّا عَلَى اثْنَيْنِ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْقُرْاٰنَ فَهُوَ يَقُوْمُ بِهٖ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَاٰنَاءَ النَّهَارِ وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَاٰنَاءَ النَّهَارِ (رواه البخاري والترمذي والنسائي)

ابن عمرؓ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ حسد دو شخصوں کے سوا کسی پر جائز نہیں۔ ایک وہ جس کو حق تعالیٰ شانہٗ نے قرآن شریف کی تلاوت عطا فرمائی اور وہ دن رات اس میں مشغول رہتا ہے دوسرے وہ جس کو حق سبحانہٗ نے مال کی کثرت عطا فرمائی اور وہ دن رات اس کو خرچ کرتا ہے۔

(৫) হযরত ইবনে ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, দুই ব্যক্তি ছাড়া আর কাহারও উপর হাছাদ (অর্থাৎ হিংসা) করা জায়েয নাই। এক, ঐ ব্যক্তি যাহাকে আল্লাহ তায়ালা কুরআন শরীফ তেলাওয়াতের তওফীক দিয়াছেন এবং সে দিন–রাত্র উহাতে মশগুল থাকে। দ্বিতীয় ঐ ব্যক্তি যাহাকে আল্লাহ তায়ালা প্রচুর ধন–সম্পদ দান করিয়াছেন এবং সে দিন–রাত্র উহা হইতে (আল্লাহর রাস্তায়) খরচ করিতে থাকে। (বুখারী, তিরমিযী, নাসাঈ)

কুরআন ও হাদীসের বহু বর্ণনা দ্বারা হিংসা সম্পূর্ণরূপে নিন্দনীয় ও নাজায়েয বলিয়া বুঝা যায়। কিন্তু এই হাদীসের দ্বারা দুই ব্যক্তির ব্যাপারে হিংসা জায়েয বুঝা যায়। যেহেতু হিংসা নাজায়েয হওয়া সম্পর্কিত

রেওয়ায়াতসমূহ বহু প্রসিদ্ধ ও অধিক বিধায় ওলামায়ে কেরাম এই হাদীসের দুইটি অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন। প্রথমতঃ এই হাদীসে হাছাদ শব্দটি ঈর্ষার অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যাহাকে আরবীতে গিব্‌তা বলে। হাছাদ ও গিবতার মধ্যে পার্থক্য এই যে, কাহারও উপর কোন নেয়ামত দেখিয়া এই কামনা করা যে, এই নেয়ামত আমি লাভ করি বা না করি তাহার নিকট যেন উহা না থাকে—ইহাকে হাছাদ বা হিংসা বলে। পক্ষান্তরে, কাহারও নেয়ামত দেখিয়া এই আকাঙ্খা করা যে, ইহা তাহার নিকট থাকুক বা না থাকুক আমি যেন লাভ করি—ইহাকে গিবতা বা ঈর্ষা বলে। হাছাদ যেহেতু সর্বসম্মতিক্রমে হারাম তাই ওলামায়ে কেরাম হাছাদ শব্দটিকে রূপক হিসাবে গিব্‌তার অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। এই গিব্‌তা করা দুনিয়াবী বিষয়ে জায়েয এবং দ্বীনি বিষয়ে মুস্তাহাব। দ্বিতীয় অর্থ ইহাও হইতে পারে যে, অনেক সময় কোন কথা বুঝাইবার জন্য অনুমান বা ধরা যাক অর্থে ব্যবহার হইয়া থাকে। অর্থাৎ হাছাদ যদি জায়েয হইত তবে এই দুইটি বিষয় এমন যে, উহাতে জায়েয হইত।

(৬) عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الْأُتْرُجَّةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ التَّمْرَةِ لَا رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ لَيْسَ لَهَا رِيحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ (رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة)

ابُوموسیٰؓ نے حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو مسلمان قرآن شریف پڑھتا ہے اس کی مثال ترنج کی سی ہے اس کی خوشبو بھی عمدہ ہوتی ہے اور مزہ بھی لذیذ، اور جو مومن قرآن شریف نہ پڑھے اس کی مثال کھجور کی سی ہے کہ خوشبو کچھ نہیں مگر مزہ شیریں ہوتا ہے، اور جو منافق قرآن شریف نہیں پڑھتا، اس کی مثال حنظل کے پھل کی سی ہے کہ مزہ کڑوا اور خوشبو کچھ نہیں اور جو منافق قرآن شریف پڑھتا ہے اس کی مثال خوشبودار پھول کی سی ہے کہ خوشبو عمدہ اور مزہ کڑوا۔

(৬) হযরত আবূ মূসা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, যে মুসলমান কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করে তাহার দৃষ্টান্ত হইল তুরনজ (বা কমলালেবু)এর ন্যায়।

যাহার খোশবুও উত্তম এবং স্বাদও চমৎকার। আর যে মুসলমান কুরআন শরীফ পাঠ করে না তাহার দৃষ্টান্ত হইল খেজুরের ন্যায়। যাহার কোন খোশবু নাই কিন্তু স্বাদ খুবই মিষ্ট। আর যে মুনাফিক কুরআন শরীফ পড়ে না তাহার দৃষ্টান্ত হইল হান্‌জাল ফলের ন্যায়। যাহার স্বাদ তিক্ত এবং কোন খোশবু নাই। আর যে মুনাফিক কুরআন শরীফ পাঠ করে তাহার দৃষ্টান্ত হইল সুগন্ধি ফুলের ন্যায়। যাহার খোশবু চমৎকার কিন্তু স্বাদ তিক্ত।

(বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)

এই হাদীসের উদ্দেশ্য হইল, অনুভব করা যায় না এমন জিনিসকে অনুভবযোগ্য জিনিসের সহিত তুলনা করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া। যাহাতে কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করা এবং না করার মধ্যে কি পার্থক্য তাহা সহজে বুঝে আসিয়া যায়। নতুবা অত্যন্ত স্পষ্ট কথা যে, কালামে পাকের স্বাদ ও সুগন্ধির সহিত তুরন্‌জ ও খেজুরের কোন তুলনাই হইতে পারে না। তবে এইসব বস্তুর সহিত তুলনার মধ্যে সূক্ষ্ম রহস্য রহিয়াছে যাহা এলমে নবুওতের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জ্ঞানের ব্যাপকতার প্রতি ইঙ্গিত করে। যেমন, তুরন্‌জের কথাই ধরুন। ইহা মুখে সুগন্ধি আনয়ন করে, পেট পরিস্কার করে এবং হজম শক্তি বৃদ্ধি করে ইত্যাদি। এই উপকারগুলি এমন যে, কুরআন তেলাওয়াতের সাথে এইগুলির খাছ সম্পর্ক রহিয়াছে। যেমন মুখ খোশবুদার হওয়া, অন্তর পরিস্কার হওয়া এবং রূহানী শক্তি বৃদ্ধি হওয়া। এইগুলি পূর্বে উল্লেখিত উপকারসমূহের সহিত খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ। তুরন্‌জের একটি বিশেষত্ব ইহাও যে, যে ঘরে তুরন্‌জর থাকে সেই ঘরে জ্বিন প্রবেশ করিতে পারে না। যদি এই কথা ঠিক হয়, তবে কালামে পাকের সহিত ইহার বিশেষ মিল রহিয়াছে। কোন কোন চিকিৎসকের নিকট হইতে শুনিয়াছি যে, তুরন্‌জের দ্বারা স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পায়। 'এহ্‌ইয়া' কিতাবে হযরত আলী (রাযিঃ) হইতে নকল করা হইয়াছে যে, তিনটি বস্তুর দ্বারা স্মরণ শক্তি বাড়িয়া যায়। সেইগুলি হইল মেসওয়াক, রোযা এবং কালামুল্লাহ শরীফের তেলাওয়াত।

আবূ দাউদ শরীফে এই হাদীসের শেষ অংশে আরও একটি অত্যন্ত উপকারী কথা উল্লেখ রহিয়াছে যে—'উত্তম সাথীর দৃষ্টান্ত হইল মেশকের খোশবূওয়ালা লোকের মত। তুমি যদি তাহার নিকট হইতে মেশ্‌ক নাও পাও অন্তত খোশবু তো পাইবেই। আর অসৎ সাথীর দৃষ্টান্ত হইল আগুনের চুল্লিওয়ালার মত। যদি কয়লার কালি তোমার গায়ে নাও লাগে তবে ধুয়া হইতে তো বাঁচিতে পারিবে না।' বিষয়টি অত্যন্ত আহাম ও

গুরুত্বপূর্ণ—মানুষকে তাহার সাথীদের ব্যাপারেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে, অর্থাৎ কি ধরণের লোকদের সহিত সে সবসময় উঠাবসা ও চলাফেরা করিতেছে।

(٧) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ يَرْفَعُ بِهٰذَا الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهٖ اٰخَرِيْنَ (رواه مسلم)

حضرت عمرؓ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ حق تعالےٰ شانہٗ اس کتاب یعنی قرآن پاک کی وجہ سے کتنے ہی لوگوں کو بلند مرتبہ کرتا ہے اور کتنے ہی لوگوں کو پست وذلیل کرتا ہے۔

(৭) হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা এই কিতাব অর্থাৎ কুরআন পাকের দ্বারা বহু লোককে উচ্চ মর্যাদা দান করেন এবং বহু লোককে নীচু ও অপদস্থ করেন। (মুসলিম)

অর্থাৎ যাহারা উহার উপর ঈমান আনে ও আমল করে আল্লাহ তায়ালা তাহাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে উচ্চ মর্যাদা ও ইজ্জত দান করেন। আর যাহারা উহার উপর আমল করে না আল্লাহ তায়ালা তাহাদেরকে অপদস্থ করেন। কালামে পাকের একটি আয়াত দ্বারাও এই কথা প্রমাণিত হয়— يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا وَّيَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা এই কুরআনের দ্বারা অনেক লোককে হেদায়াত দান করেন এবং অনেক লোককে গুমরাহ করেন। (সূরা বাকারা, আয়াত ঃ ২৬)

অন্য এক আয়াতে এরশাদ হইয়াছে—

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا ؀ (سورہ بنی اسرائیل ع ۹)

অর্থাৎ আমি কুরআনের মধ্যে এমন বিষয় নাযিল করিয়াছি যাহা ঈমানদারদের জন্য রোগমুক্তি ও রহমত স্বরূপ আর জালেমদের জন্য কেবল ক্ষতিই বৃদ্ধি করে। (সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ঃ ৮২)

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন—এই উম্মতের মধ্যে বহু মুনাফেক ক্বারী হইবে। কোন কোন মাশায়েখ হইতে 'এহ্‌ইয়া উল উলূম' কিতাবে নকল করা হইয়াছে যে, বান্দা যখন কালামে পাকের কোন সূরা পড়িতে শুরু করে তখন ফেরেশতারা উহা শেষ করা পর্যন্ত তাহার উপর রহমতের দোয়া করিতে থাকে, আবার কোন ব্যক্তি যখন কুরআন পাকের একটি সূরা পড়িতে শুরু করে, তখন ফেরেশতারা

উহা শেষ করা পর্যন্ত তাহার উপর লানত করিতে থাকে। কোন কোন আলেম হইতে বর্ণিত আছে যে, মানুষ তেলাওয়াত করে এবং নিজেই নিজের উপর লানত করিতে থাকে অথচ সে উহা টেরও পায় না। কুরআন শরীফে সে এই আয়াত পড়ে—

اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ؀

অর্থাৎ জালেমদের উপর আল্লাহর লানত।" (সূরা হূদ, আয়াত ঃ ১৮) আর সে নিজেই জালেম হওয়ার কারণে এই লানতের অন্তর্ভুক্ত হয়। এমনিভাবে সে এই আয়াতও পড়ে ঃ

لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ ؀

অর্থাৎ "মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহর লানত।" (সূরা আলি ইমরান, আয়াত ঃ ৬১) আর সে নিজে মিথ্যাবাদী হওয়ার কারণে নিজেই এই লানতের যোগ্য হইয়া যায়।

হযরত আমের ইবনে ওয়াছিলাহ (রাযিঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাযিঃ) নাফে ইবনে আব্দুল হারেসকে মক্কা মুকাররামার শাসনকর্তা নিয়োগ করিয়াছিলেন। একবার হযরত ওমর (রাযিঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বন বিভাগের দায়িত্বভার কাহাকে দিয়াছ? তিনি আরজ করিলেন, ইবনে আব্‌যাকে। হযরত ওমর (রাযিঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইবনে আব্‌যা কে? তিনি আরজ করিলেন, সে আমার একজন গোলাম। হযরত ওমর (রাযিঃ) অভিযোগের সুরে বলিলেন, গোলামকে কেন আমীর বানাইয়াছ? তিনি আরজ করিলেন, সে কুরআন শরীফ ভাল পড়িতে পারে। তখন হযরত ওমর (রাযিঃ) এই হাদীস বর্ণনা করিলেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা এই কালামে পাকের বদৌলতে বহু লোককে উচ্চ মর্যাদা দান করেন এবং বহু লোককে অপদস্থ করেন।

(٨) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِؓ بْنِ عَوْفٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلٰثٌ تَحْتَ الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَلْقُرْاٰنُ يُحَاجُّ الْعِبَادَ لَهٗ ظَهْرٌ وَّبَطْنٌ وَّالْاَمَانَةُ وَالرَّحِمُ تُنَادِيْ اَلَا مَنْ وَّصَلَنِيْ وَصَلَهُ اللّٰهُ وَمَنْ

عبدالرحمٰنؓ بن عوف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ تین چیزیں قیامت کے دن عرش کے نیچے ہوں گی ایک کلام پاک کہ جھگڑے گا بندوں سے، قرآن پاک کے لئے ظاہر ہے اور باطن، دوسری چیز امانت ہے۔ اور تیسری رشتہ داری جو پکارے گی کہ جس

قَطَعَنِيْ قَطَعَهُ اللّٰهُ (رواه فى شرح السنة) شخص نے مجھ کو جوڑا اللہ اس کو اپنی رحمت سے ملاوے اور جس نے مجھ کو توڑا، اللہ اپنی رحمت سے اس کو جدا کرے۔

(৮) হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত ঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, তিনটি জিনিস কিয়ামতের দিন আরশের নীচে থাকিবে। প্রথমঃ কালামে পাক। উহা সেইদিন বান্দার ব্যাপারে ঝগড়া করিবে—এই কুরআনের জাহের ও বাতেন দুইটি দিক রহিয়াছে। দ্বিতীয়ঃ আমানত। তৃতীয়ঃ আত্মীয়তা ; ইহা সেই দিন উচ্চ আওয়াজে বলিতে থাকিবে, যে ব্যক্তি আমাকে রক্ষা করিয়াছে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে আপন রহমতের সহিত মিলাইয়া দিন। আর যে ব্যক্তি আমাকে ছিন্ন করিয়াছে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে আপন রহমত হইতে পৃথক করিয়া দিন। (শরহুস-সুন্নাহ্)

এই জিনিসগুলি আরশের নীচে হওয়ার অর্থ হইল, এইগুলি পরিপূর্ণ নৈকট্য লাভ করিবে। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার মহান দরবারে এইগুলি খুবই নিকটবর্তী হইবে। কালামে পাকের ঝগড়া করিবার অর্থ হইল, যাহারা কুরআনকে পুরাপুরি মানিয়াছে, উহার হক আদায় করিয়াছে, উহার উপর আমল করিয়াছে তাহাদের পক্ষে আল্লাহ তায়ালার দরবারে ঝগড়া করিবে, সুপারিশ করিবে এবং তাহাদের মর্তবা বুলন্দ করাইবে।

মোল্লা আলী কারী (রহঃ) তিরমিযী শরীফের রেওয়ায়াতে নকল করিয়াছেন যে, কুরআন শরীফ আল্লাহর দরবারে আরজ করিবে, ইয়া আল্লাহ! তাহাকে পোষাক দান করুন। তখন আল্লাহ তায়ালা সম্মানের তাজ দান করিবেন। অতঃপর আরও বেশী দেওয়ার দরখাস্ত করিবে। তখন আল্লাহ তায়ালা সম্মানের পুরা পোষাক দান করিবেন। অতঃপর সে দরখাস্ত করিবে, ইয়া আল্লাহ! আপনি এই ব্যক্তির উপর রাজী হইয়া যান। তখন আল্লাহ তায়ালা এই ব্যক্তির উপর নিজের সন্তুষ্টি ঘোষণা করিয়া দিবেন। দুনিয়াতেই যখন প্রিয়জনের সন্তুষ্টির চাইতে বড় আর কোন নেয়ামত হয় না, তখন আখেরাতে প্রিয়জনের সন্তুষ্টির মুকাবিলা আর কোন নেয়ামত করিতে পারিবে? আর যাহারা কুরআনের হক নষ্ট করিয়াছে তাহাদেরকে কুরআন জিজ্ঞাসা করিবে যে, আমার কি খেয়াল রাখিয়াছ? আমার কি হক আদায় করিয়াছ?

'শরহে এহইয়া' কিতাবে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) হইতে নকল করা হইয়াছে যে, বছরে দুইবার খতম করা কুরআনের হক। এখন ঐ সব লোক যাহারা ভুল করিয়াও তেলাওয়াত করেন না তাহারা একটু চিন্তা করিয়া

দেখুন যে, এই শক্তিশালী প্রতিপক্ষের সামনে কি জবাবদিহি করিবেন? মৃত্যু অবশ্যই আসিবে। উহা হইতে কোন ভাবেই পলায়নের উপায় নাই।

'কুরআনের জাহের ও বাতেন হওয়ার' অর্থ হইল, কুরআনের একটি জাহেরী অর্থ রহিয়াছে যাহা সকলেই বুঝিতে পারে আর একটি বাতেনী অর্থ রহিয়াছে যাহা সকলেই বুঝিতে পারে না। এই দিকে ইঙ্গিত করিয়া হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কুরআনে পাকের মধ্যে নিজের রায়ের দ্বারা কিছু বলিল, সে শুদ্ধ বলিলেও ভুল করিল। কোন কোন মাশায়েখ বলিয়াছেন, জাহের অর্থ কুরআনের শব্দসমূহ, যাহা তেলাওয়াতের ব্যাপারে সকলেই সমান। আর বাতেন অর্থ হইল কুরআনের অর্থ ও মর্ম যাহা যোগ্যতা অনুসারে বিভিন্নরূপ হইয়া থাকে।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, যদি এলেম চাও, তবে কুরআন পাকের অর্থের মধ্যে চিন্তা-ফিকির কর। উহাতে আওয়ালীন ও আখেরীন অর্থাৎ পূর্ব-পরের সব এলেম রহিয়াছে। তবে কুরআন পাকের অর্থ বুঝিবার জন্য যে সকল শর্ত ও নিয়ম রহিয়াছে সেইগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখা খুবই জরুরী। এমন যেন না হয় যে, আমাদের এই জমানার মত কয়েকটি আরবী শব্দের অর্থ শিখিয়া কিংবা শব্দার্থ না জানিয়া শুধুমাত্র কুরআনের তরজমা দেখিয়া নিজের রায়কে উহার মধ্যে দাখেল করিয়া দিল। তফসীরবিদগণ তফসীর করার জন্য পনরটি এলেমের উপর পূর্ণ দক্ষতা হাসিল করা জরুরী বলিয়াছেন। বর্তমান সময়ে ইহার জরুরতের প্রতি খেয়াল করিয়া এখানে সেইগুলি সংক্ষিপ্তভাবে পেশ করিতেছি। ইহাতে বুঝা যাইবে যে, কালামে পাকের গভীর পর্যন্ত পৌছা সকলের জন্য সম্ভব নয়।

(১) আভিধানিক অর্থ জানা। ইহা দ্বারা কালামে পাকের একক শব্দসমূহের অর্থ জানা যায়। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর এবং কিয়ামত দিবসের উপর ঈমান রাখে তাহার জন্য আরবী আভিধানিক অর্থ জানা ছাড়া কালামে পাকের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র মুখ খোলাও জায়েয নাই। আর কয়েকটি শব্দার্থ জানিয়া নেওয়াই যথেষ্ট নহে। কেননা, অনেক সময় একটি শব্দের কয়েকটি অর্থ হইয়া থাকে অথচ সে উহা হইতে দুই-একটি অর্থ জানে আর সেখানে প্রকৃতপক্ষে অন্য কোন অর্থ উদ্দেশ্য হইয়া থাকে।

(২) এলমে নাহু অর্থাৎ আরবী ভাষার ব্যাকরণ জানা। কেননা যের যবর পেশ-এর পরিবর্তনে বাক্যের অর্থও পরিবর্তন হইয়া যায়। আর এই

জ্ঞান এলমে নাহুর উপর নির্ভর করে।

(৩) এলমে ছরফ অর্থাৎ শব্দ গঠন প্রণালী জানা। কেননা শব্দ গঠন প্রণালীর বিভিন্নতার কারণে অর্থও ভিন্ন হইয়া যায়। ইবনে ফারেস (রহঃ) বলেন, যে এলমে ছরফ জানে না সে অনেক কিছুই জানে না। আল্লামা যমখশরী (রহঃ) তাহার 'উজুবাতে তাফসীর' কিতাবে একটি ঘটনা নকল করিয়াছেন যে, এক ব্যক্তি এলমে ছরফ না জানার কারণে কুরআনের আয়াত يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ (সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ঃ ৭১) অর্থাৎ যেদিন আমি প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার ইমাম ও নেতাদের সহিত ডাকিব-এর তাফসীর করিল—'যে দিন আমি প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার মায়ের সহিত ডাকিব।' এখানে সে 'ইমাম' শব্দটিকে 'উম্' (মা) এর বহুবচন মনে করিয়া বসিয়াছে। যদি সে এলমে ছরফ জানিত, তবে সে বুঝিতে পারিত যে, 'উম্'-এর বহুবচন 'ইমাম' আসে না।

(৪) এলমে এশতেকাক অর্থাৎ ধাতুগত অর্থ জানা। কারণ, কোন শব্দ যখন দুইটি ধাতু হইতে বাহির হইয়া আসে তখন উহার অর্থ ভিন্ন হয়। যেমন مَسِيْحٌ একটি শব্দ। ইহা مَسْحٌ ধাতু হইতে বাহির হইলে অর্থ হইবে স্পর্শ করা এবং কোন কিছুর উপর ভিজা হাত বুলানো। আর مِسَاحَت হইতে বাহির হইলে ইহার অর্থ হইবে পরিমাপ করা।

(৫) এলমে মাআনী। এই এলেম দ্বারা অর্থ হিসাবে বাক্যের শব্দসমূহের পরস্পর সম্পর্ক জানা যায়।

(৬) এলমে বয়ান। এই এলেম দ্বারা বাক্যের স্পষ্টতা ও অস্পষ্টতা এবং তুলনা ও ইশারা-ইঙ্গিত জানা যায়।

(৭) এলেমে বাদী'। এই এলেম দ্বারা ভাব প্রকাশে বাক্যের সৌন্দর্য জানা যায়। মাআনী, বয়ান ও বাদী' এই তিনটিকে একসাথে এলমে বালাগাত বা অলংকার শাস্ত্র বলা হয়। কুরআন তাফসীরের জন্য এইগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ কুরআনে পাক সম্পূর্ণরূপে অলৌকিক গ্রন্থ। আর এই তিন এলেমের দ্বারা উহার অলৌকিকত্ব জানা যায়।

(৮) এলমে কেরাত। বিভিন্ন কেরাতের দ্বারা বিভিন্ন অর্থ এবং এক অর্থের উপর অন্য অর্থের প্রাধান্য জানা যায়।

(৯) এলমে আকায়েদ। কালামে পাকে অনেক আয়াত এমন আছে, যেগুলির জাহেরী অর্থ আল্লাহ পাকের শানে ব্যবহার করা ঠিক হয় না। তাই এইসব আয়াতের ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন দেখা দেয়। যেমন—

يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ অর্থাৎ 'আল্লাহর হাত তাহাদের হাতের উপর।' (সূরা ফাত্‌হ, আয়াত ঃ ১০)

(১০) উসূলে ফেকাহ। এই এলেম দ্বারা দলীল-প্রমাণের প্রয়োগ ও বিধি-বিধান আহরণের কারণসমূহ জানা যায়।

(১১) শানে নুযূল অর্থাৎ আয়াতসমূহ নাযিল হওয়ার কারণসমূহ জানা। শানে নুযূলের দ্বারা আয়াতের অর্থ অধিক স্পষ্ট হয়। অনেক ক্ষেত্রে আসল অর্থ জানাও ইহার উপর নির্ভর করে।

(১২) নাসেখ ও মানসূখ জানা। এই এলেম দ্বারা রহিত আহকাম ও আমলযোগ্য আহকামের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়।

(১৩) এলমে ফেকাহ। এই এলেম দ্বারা শাখাগত বিধানসমূহ আয়ত্ব করিয়া জুযিয়াত (শাখা) আয়ত্ব করিলে মূলনীতি চিনা যায়।

(১৪) ঐ সকল হাদীস জানাও জরুরী, যেগুলি কুরআন পাকের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা সম্বলিত আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা হিসাবে বর্ণিত হইয়াছে।

(১৫) এলমে ওয়াহবী বা আল্লাহ প্রদত্ত এলেম হাসিল হওয়াও জরুরী। ইহা আল্লাহ তায়ালার খাছ দান। খাছ বান্দাগণকেই এই এলেম দান করা হয়। নিম্নের হাদীস শরীফে এই দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে—

مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ وَرَّثَهُ اللّٰهُ عِلْمَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজের জানা বিষয়ের উপর আমল করে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে অজানা বিষয়ের এলেম দান করেন।

হযরত আলী (রাযিঃ) এই দিকেই ইশারা করিয়াছেন। লোকেরা যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে কি কোন খাছ এলেম দান করিয়াছেন বা কোন খাছ ওসীয়ত করিয়া গিয়াছেন? যাহা শুধু আপনার সহিত সম্পর্কিত অন্যদের জন্য নহে। তিনি বলিলেন, ঐ পাক যাতের কসম! যিনি জান্নাত বানাইয়াছেন এবং জান পয়দা করিয়াছেন, ঐ জ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই নহে যাহা আল্লাহ তায়ালা কালামে পাক বুঝিবার জন্য কোন বান্দাকে দান করিয়া থাকেন। ইবনে আবিদ্দুনিয়া (রহঃ) বলেন, কুরআনের এলেম এবং উহা দ্বারা যাহা হাসিল হয় তাহা এমন সমুদ্র যাহার কোন কূল কিনারা নাই।

উপরে বর্ণিত এলেমগুলি একজন মুফাস্‌সিরের জন্য হাতিয়ার স্বরূপ। এই এলেমসমূহ জানা ব্যতীত কেহ কুরআন তফসীর করিলে উহা তফসীর বির রায় (মনগড়া তাফসীর) বলিয়া গণ্য হইবে, যাহা নিষেধ করা হইয়াছে।

আরবী ভাষা সম্পর্কিত এলেমসমূহ সাহাবায়ে কেরামের জন্মগতভাবে হাসিল ছিল। আর বাকী এলেমগুলি তাহারা পাইয়াছিলেন নবুওয়তের

আলোক-ভাণ্ডার হইতে। আল্লামা সুয়ূতী (রহঃ) বলেন, তোমার হয়ত এইরূপ ধারণা হইতে পারে যে, আল্লাহ-প্রদত্ত এলেম হাসিল করা বান্দার সামর্থের বাহিরে। কিন্তু ইহা ঠিক নয়। আসল কথা হইল, আল্লাহ-প্রদত্ত এলেম হাসিল করার জন্য এমন সব উপায় ও আসবাব গ্রহণ করিতে হইবে, যাহার উপর আল্লাহ তায়ালা এই এলেম দান করিয়া থাকেন। যেমন, জানা এলেমের উপর আমল করা এবং দুনিয়ার প্রতি আগ্রহ না থাকা ইত্যাদি।

ইমাম গাযয্‌লী (রহঃ) 'কিমিয়ায়ে সাআদত' কিতাবে লিখিয়াছেন, তিন ব্যক্তির উপর কুরআনের তফসীর প্রকাশিত হয় না। অর্থাৎ তাহাদের তফসীর বুঝার ক্ষমতা হয় না। (প্রথম) যে ব্যক্তি আরবী ভাষা জানে না। (দ্বিতীয়) যে ব্যক্তি কবীরা গুনাহে লিপ্ত থাকে অথবা বেদআতী হয়। কেননা এই গোনাহ ও বেদআতের কারণে তাহার অন্তর কালো হইয়া যায়। ফলে কুরআনের মারেফত ও রহস্য বুঝিতে সে অক্ষম হইয়া পড়ে। (তৃতীয়) যে ব্যক্তি কোন আকীদাগত বিষয়ে বাহ্যিক দিককে গ্রহণ করে এবং কুরআনের যে আয়াত উহার বিপরীত হয় উহা গ্রহণ করিতে তাহার মন তৈয়ার হয় না। এইরূপ ব্যক্তিও কুরআনের জ্ঞান হইতে বঞ্চিত থাকে। আয় আল্লাহ! আপনি আমাদের হেফাজত করুন।

(৯) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍوؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْاٰنِ اِقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِى الدُّنْيَا فَاِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ اٰخِرِ اٰيَةٍ تَقْرَأُهَا (رواه احمد والترمذی وابوداؤد و النسائی وابن ماجة وابن حبان فی صحیحه)

عبداللہ بن عمروؓ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے (کہ قیامت کے دن) صاحب قرآن سے کہا جاوے گا کہ قرآن شریف پڑھتا جا اور بہشت کے درجوں پر چڑھتا جا۔ اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا۔ بس تیرا مرتبہ وہی ہے، جہاں آخری آیت پر پہنچے۔

(৯) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত ঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন যে, কিয়ামতের

দিন ছাহেবে কুরআনকে বলা হইবে, কুরআন শরীফ পড়িতে থাক এবং বেহেশতে মর্যাদার স্তরসমূহে আরোহণ করিতে থাক এবং থামিয়া থামিয়া পড় যেভাবে দুনিয়াতে থামিয়া থামিয়া পড়িতে। তোমার মর্যাদা উহাই হইবে, যেখানে তুমি শেষ আয়াতে পৌঁছিবে।

(আহমদ, তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান)

'ছাহেবে কুরআন' দ্বারা বাহ্যতঃ হাফেজকে বুঝানো হইয়াছে। মোল্লা আলী কারী (রহঃ) বিস্তারিত আলোচনায় এই ফযীলত হাফেজদের জন্যই সাব্যস্ত করিয়াছেন ; নাযেরা পড়নেওয়ালাগণ ইহার মধ্যে শামেল নয়। প্রথমতঃ এই কারণে যে, ছাহেবে কুরআন শব্দটিই এই দিকে ইঙ্গিত করে। দ্বিতীয়তঃ এই কারণে যে, 'মুসনাদে আহমাদ' কিতাবে বর্ণিত আছে— حَتّٰى يَقْرَءَ شَيْئًا مَّعَهٗ অর্থাৎ, যতটুকু কুরআন শরীফ তাহার সঙ্গে আছে সবটুকু পড়িবে। এই বাক্যটি আরও স্পষ্ট করিয়া দেয় যে, ইহা দ্বারা হাফেজকে বুঝানো হইয়াছে। যদিও বেশী পরিমাণে তেলাওয়াতকারী নাজেরা পড়নেওয়ালাগণও ইহার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

'মিরকাত' কিতাবে আছে, এইরূপ পড়নেওয়ালা ইহার অন্তর্ভুক্ত নয় যাহাকে কুরআন লানত করে। যেমন অন্য এক হাদীসে আছে, বহু কুরআন পড়নেওয়ালা এমন আছে, যাহারা কুরআন পড়ে কিন্তু কুরআন তাহাদের উপর লানত করে। কাজেই যদি কোন ব্যক্তির ঈমান-আকীদা দুরস্ত না থাকে তবে কুরআন শরীফ পড়ার দ্বারা তাহাকে মকবূল বলা যাইবে না। খারেজী সম্প্রদায়ের লোকদের ব্যাপারে এই ধরণের বহু হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

তারতীল অর্থাৎ 'থামিয়া থামিয়া পড়া' সম্পর্কে শাহ আব্দুল আযীয (রহঃ) তাহার তাফসীর গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, অভিধানে পরিস্কার ও স্পষ্ট করিয়া পড়াকে তারতীল বলে। আর শরীয়তের পরিভাষায় কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তেলাওয়াত করাকে তারতীল বলে। যথা ঃ—

(১) হরফসমূহ সহীহভাবে উচ্চারণ করা অর্থাৎ মাখরাজ আদায় করিয়া পড়া। যাহাতে ط এর জায়গায় ت এবং ضاد এর জায়গায় ظ উচ্চারণ না হয়।

(২) ওয়াকফ-এর জায়গায় ভালভাবে থামা। যাহাতে বাক্যের সংযোগ ও বিরাম অসঙ্গত না হয়।

(৩) হরকতসমূহে ইশবা' করা। অর্থাৎ যের যবর ও পেশকে ভালভাবে স্পষ্ট করিয়া পড়া।

(৪) আওয়াজ কিছুটা বুলন্দ করিয়া পড়া। যাহাতে কালামে পাকের

শব্দসমূহ জবান হইতে বাহির হইয়া কান পর্যন্ত পৌছে এবং অন্তরে আছর করে।

(৫) এইরূপ আওয়াজে পড়া যাহাতে দরদ পয়দা হয় এবং দিলের উপর তাড়াতাড়ি আছর করিতে পারে। কেননা দরদ ভরা আওয়াজ দিলের উপর খুব দ্রুত আছর করে এবং রূহ শক্তিশালী হয় ও আছর গ্রহণ করে। এই কারণেই হাকিমগণ বলিয়াছেন, যে ঔষধের আছর অন্তরে পৌছান দরকার উহা সুগন্ধির সহিত মিশাইয়া দেওয়া চাই। এইভাবে দিল উহাকে তাড়াতাড়ি টানিয়া নেয়। আর যে ঔষধের আছর কলিজায় পৌছান দরকার উহা মিষ্টির সহিত মিলাইয়া দেওয়া চাই। কারণ কলিজা মিষ্টি চোষণ করিয়া থাকে। তাই আমার মতে তেলাওয়াতের সময় যদি খাছভাবে সুগন্ধি ব্যবহার করা হয় তবে অন্তরের উপর প্রভাব বিস্তারে অধিক সহায়ক হইবে।

(৬) তাশদীদ ও মদকে ভালভাবে স্পষ্ট করিয়া পড়া। কারণ এইগুলি স্পষ্ট করিয়া পড়ার দ্বারা কালামে পাকের আজমত প্রকাশ পায় এবং অন্তরে প্রভাব সৃষ্টি করিতে সহায়ক হয়।

(৭) রহমত ও আজাবের আয়াতসমূহের হক আদায় করা। যাহা ভূমিকায় আলোচনা করা হইয়ছে।

এই সাতটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখাকেই তারতীল বলা হয়। আর এই সবগুলির মূল উদ্দেশ্য একটাই, অর্থাৎ কালামে পাকের মধ্যে গবেষণা ও চিন্তা-ফিকির করা। হযরত উম্মে সালামা (রাযিঃ)কে কেহ জিজ্ঞাসা করিল যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন শরীফ কিভাবে তেলাওয়াত করিতেন? তিনি বলিলেন, হরকতসমূহকে বাড়াইতেন অর্থাৎ যের যবর ইত্যাদি পরিপূর্ণভাবে উচ্চারণ করিতেন এবং প্রত্যেকটি হরফ পৃথক পৃথক ও স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করিতেন। তারতীলের সহিত তেলাওয়াত করা মুস্তাহাব যদিও অর্থ বুঝে না আসে।

ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, আমি তারতীলের সহিত সূরা আল-কারিয়া ও সূরা ইযা যুলযিলাত পাঠ করি ; ইহা আমার নিকট তারতীল ছাড়া সূরা বাকারা ও সূরা আলি ইমরান পাঠ করা হইতেও উত্তম।

ব্যাখ্যাকারীগণ ও মাশায়েখগণ বর্ণিত হাদীসের অর্থ এইরূপ করিয়াছেন যে, কুরআনে পাকের এক একটি আয়াত পড়িতে থাক এবং মর্যাদার এক একটি স্তরে উঠিতে থাক। কারণ, বিভিন্ন রেওয়ায়েতের দ্বারা বুঝা যায় যে, জান্নাতের স্তর কালামুল্লাহ শরীফের আয়াতের বরাবর। সুতরাং যে ব্যক্তি

যতগুলি আয়াতের পারদর্শী হইবে ততগুলি স্তর উপরে তাহার ঠিকানা হইবে। আর যে ব্যক্তি পুরা কালামে পাকের পারদর্শী হইবে, তাহার ঠিকানা সবচেয়ে উপরের স্তরে হইবে।

মোল্লা আলী কারী (রহঃ) লিখিয়াছেন যে, হাদীস শরীফে আসিয়াছে, কুরআন পাঠকারীর চেয়ে উপরে জান্নাতে আর কোন স্তর নাই। সুতরাং কুরআন পাঠকারীগণ আয়াতসমূহ পরিমাণ উন্নতি করিবেন। আল্লামা দানী (রহঃ) হইতে নকল করা হইয়াছে যে, কেরাতবিশারদগণ এই ব্যাপারে একমত যে, কুরআন শরীফে ছয় হাজার আয়াত আছে। কিন্তু পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে মতভেদ আছে। কয়েকটি মতামত হইল ২০৪, ১৪, ১৯, ২৫, ৩৬।

'শরহে এহ্ইয়া' কিতাবে আছে যে, প্রতিটি আয়াত জান্নাতের এক একটি স্তর। সুতরাং ক্বারীকে বলা হইবে, নিজের তেলাওয়াত পরিমাণ জান্নাতের স্তরে আরোহণ করিতে থাক। যে ব্যক্তি পুরা কুরআন শরীফ পড়িয়া নিবে সে জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তরে পৌছিয়া যাইবে। আর যে ব্যক্তি কিছু অংশ পড়িয়া থাকিবে সে সেই পরিমাণ মর্যাদায় গিয়া পৌছিবে। মোট কথা, কেরাত যেখানে শেষ হইবে তাহার মর্যাদার স্তরও সেখানে শেষ হইবে।

বান্দার (লেখকের) মতে এই হাদীসটির অন্য একটি অর্থ হইতে পারে—যদি ইহা ঠিক হয় তবে আল্লাহর পক্ষ হইতে ; আর ভুল হইলে উহা আমার ও শয়তানের পক্ষ হইতে ; আল্লাহ ও তাহার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহা হইতে সম্পূর্ণ নির্দোষ। সেই অর্থ এই যে, উপরোক্ত হাদীসে এক এক আয়াতের দ্বারা এক এক স্তর উন্নতি লাভের যে কথা বলা হইয়াছে হাদীসে এই উন্নতি উদ্দেশ্য নয়। কারণ, এইভাবে স্তর পাওয়ার জন্য তারতীলের সহিত পড়া না পড়ার বাহ্যতঃ কোন সম্পর্ক দেখা যায় না। যখন এক আয়াত পড়া হইবে, তারতীলের সহিত পড়া হউক বা না হউক এক স্তর উন্নতি হইবে। বরং উক্ত হাদীসে বাহ্যতঃ গুণগত উন্নতি বুঝানো হইয়াছে যাহাতে তারতীলের সহিত পড়া না পড়ার দখল রহিয়াছে। সুতরাং যে তারতীলের সহিত দুনিয়াতে পড়িত সেই তারতীলের সহিত আখেরাতেও পড়িতে পারিবে এবং সেই অনুযায়ীই তাহার মর্যাদার স্তরে উন্নতিও হইতে থাকিবে।

মোল্লা আলী কারী (রহঃ) এক হাদীস হইতে বর্ণনা করেন যে, দুনিয়াতে বেশী বেশী তেলাওয়াত করিলে আখেরাতে কুরআন শরীফ ইয়াদ থাকিবে নতুবা ভুলিয়া যাইবে। আল্লাহ পাক রহম করুন—আমাদের মধ্যে

বহু লোক এমন আছে যাহাদেরকে মাতাপিতা বড় দ্বীনী আগ্রহে কুরআন শরীফ হেফজ করাইয়াছিল। কিন্তু তাহারা নিজেদের অবহেলা ও উদাসীনতার কারণে দুনিয়াতেই তাহা ভুলিয়া যায়। পক্ষান্তরে অন্য হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি কুরআন শরীফ ইয়াদ করে এবং ইহার জন্য মেহনত ও কষ্ট করিতে করিতে মারা যায়, সে হাফেজদের দলভুক্ত হইবে। আল্লাহর দরবারে দানের কোন কমী নাই যদি কেহ নেওয়ার থাকে। (কবির ভাষায়—)

اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر
تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا

অর্থাৎ, হে শহীদী ! তাহার দয়া ও মেহেরবানী সকলের জন্য বরাবর। তোমার সহিত কি জিদ ছিল ; যদি তুমি কোনরকম উপযুক্ত হইতে।

(١٠) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِّنْ كِتَابِ اللّٰهِ فَلَهٗ بِهٖ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا لَا اَقُوْلُ الٓمٓ حَرْفٌ وَّلٰكِنْ اَلِفٌ حَرْفٌ وَّلَامٌ حَرْفٌ وَّمِيْمٌ حَرْفٌ.
(رواه الترمذی وقال هذا حديث حسن صحيح غريب اسنادا والدارمی)

ابن مسعودؓ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص ایک حرف کتاب اللہ کا پڑھے اس کے لئے اس حرف کے عوض ایک نیکی ہے اور ایک نیکی کا اجر دس نیکی کے برابر ملتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارا الم ایک حرف ہے بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف۔

(১০) হযরত ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত ঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কুরআনের একটি অক্ষর পড়িবে, উহার বিনিময়ে সে একটি নেকী লাভ করিবে এবং এক নেকীর সওয়াব দশ নেকীর সমান হইবে। আমি এই কথা বলি না যে, পুরা 'আলিফ-লাম-মীম' একটি অক্ষর বরং আলিফ এক অক্ষর, লাম এক অক্ষর এবং মীম এক অক্ষর।

অর্থাৎ অন্যান্য আমলের বেলায় যেমন পুরা আমলকে একটি গণ্য করা হয়, কালামে পাকের বেলায় সেইরূপ করা হয় না। বরং এই ক্ষেত্রে আমলের এক একটি অংশকেও পুরা আমল হিসাবে গণ্য করা হয়। এই জন্যই কালামে পাকের তেলাওয়াতের বেলায় প্রতিটি অক্ষরের পরিবর্তে একটি করিয়া নেকী হয় এবং প্রতিটি নেকীর বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালার

পক্ষ হইতে দশটি করিয়া নেকীর ওয়াদা রহিয়াছে। আল্লাহ পাক বলেন ঃ

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا

অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি একটি নেকীর কাজ করিবে তাহাকে দশ নেকীর বরাবর সওয়াব দেওয়া হইবে।' (সূরা আনআম, আয়াত ঃ ১৬০) দশগুণ সওয়াবের ওয়াদা এবং ইহা সর্বনিম্ন পরিমাণ।

আরও বলিয়াছেন—

وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ

অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা যাহাকে ইচ্ছা করেন বহুগুণ বাড়াইয়া দেন।

(সূরা বাকারা, আয়াত ঃ ২৬১)

প্রতিটি অক্ষরকে পৃথক পৃথক নেকী গণ্য করার দৃষ্টান্তস্বরূপ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন যে, 'আলিফ-লাম-মীম' পুরাটা একটি অক্ষর নয় ; বরং আলিফ, লাম, মীম প্রত্যেকটিকে আলাদা আলাদা অক্ষর ধরা হইবে। এই ভাবে এখানে মোট ত্রিশটি নেকী হইয়া গেল। ইহাতে মতভেদ আছে যে, 'আলিফ-লাম-মীম' দ্বারা সূরা বাকারার প্রথম আয়াতকে বুঝানো হইয়াছে, নাকি সূরা ফীলের শুরুতে লেখা 'আলাম'কে বুঝানো হইয়াছে। সূরা বাকারার প্রথম আয়াতকে বুঝানো হইলে বাহ্যিকভাবে অর্থ হইল যে, লিখিত অক্ষর ধর্তব্য হইবে। আর যেহেতু তিনটি হরফই লেখা হয়, তাই ত্রিশটি নেকী হইবে। আর যদি ইহার দ্বারা সূরা ফীলের 'আলাম' বুঝানো হয় তবে সূরা বাকারার শুরুতে যে 'আলিফ-লাম-মীম' আছে উহাতে নয়টি অক্ষর হইবে। এই জন্য উহার বিনিময়ে নব্বই নেকী হইবে। বায়হাকীর রেওয়ায়াতে আছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন যে, আমি এই কথা বলি না যে, 'বিসমিল্লাহ' এক অক্ষর। বরং বা, সীন, মীম অর্থাৎ প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা অক্ষর।

(١١) عَنْ مُعَاذِ الْجُهَنِيِّؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيْهِ اُلْبِسَ وَالِدَاهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضَوْئُهٗ اَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ فِيْ بُيُوْتِ الدُّنْيَا لَوْ كَانَتْ فِيْكُمْ

معاذ جہنیؓ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے اُس کے والدین کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جاوے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی، اگر وہ آفتاب تمہارے گھروں

فَمَا ظَنُّكُمْ بِالَّذِىْ عَمِلَ بِهٰذَا میں ہو. پس کیا گمان ہے تمہارا اُس شخص

(رواہ احمد و ابوداؤد وصححہ الحاکم) کے متعلق جو خود عامل ہے.

(১১) হযরত মুআয জুহানী (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই এরশাদ নকল করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি কুরআন পড়িবে এবং উহার উপর আমল করিবে তাহার পিতামাতাকে কিয়ামতের দিন এমন একটি মুকুট পরানো হইবে, যাহার আলো সূর্যের আলো হইতেও বেশী হইবে যদি সেই সূর্য তোমাদের ঘরে হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি নিজে কুরআনের উপর আমল করে তাহার সম্পর্কে তোমাদের কি ধারণা!

(আবূ দাউদ, আহমদ, হাকিম)

অর্থাৎ কুরআনে পাক পড়ার এবং উহার উপর আমল করার বরকত এই যে, কুরআন পাঠকারীর মাতাপিতাকে এমন মুকুট পরানো হইবে যাহার আলো সূর্যের আলো হইতেও অনেক বেশী হইবে। যদি সেই সূর্য তোমাদের ঘরে হয়? অর্থাৎ সূর্য এত দূর হইতেও কত বেশী আলো দেয়, আর যদি উহা তোমাদের ঘরের ভিতর আসিয়া যায়, নিঃসন্দেহে উহার আলো ও চমক আরও বহুগুণ বাড়িয়া যাইবে। সুতরাং কুরআন পাঠকারীর মাতাপিতাকে যে মুকুট পরানো হইবে উহার আলো ঘরে উদিত হওয়া সূর্য হইতেও বেশী হইবে। আর যখন তেলাওয়াতকারীর পিতামাতার জন্য এত বড় সম্মান রহিয়াছে, তখন স্বয়ং তেলাওয়াতকারীর প্রতিদান কত বড় হইবে, তাহা নিজেই অনুমান করিয়া নিতে পারে। যাহারা ওসীলা তাহাদেরই যখন এত মর্যাদা তখন আসল পড়নেওয়ালার মর্যাদা আরও বহুগুণ বেশী হওয়াই স্বাভাবিক। মাতাপিতাকে এই সম্মান শুধু এই জন্যই দেওয়া হইবে যে, তাহারা সন্তানের জন্ম ও শিক্ষার মাধ্যম হইয়াছেন।

সূর্য ঘরে হওয়া সম্বন্ধে যে উপমা দেওয়া হইয়াছে, উহাতে সূর্য নিকটবর্তী হওয়ার কারণে আলো অধিক অনুভূত হওয়া ছাড়াও একটি সূক্ষ্ম বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত রহিয়াছে। উহা হইল, কোন বস্তু সবসময় কাছে থাকিলে উহার প্রতি আকর্ষণ ও মহব্বত বেশী হয়। তাই সূর্য দূরবর্তী হওয়ার কারণে যেরূপ অজানা অচেনা ভাব রহিয়াছে, সর্বদা নিকটে থাকার কারণে উহা মহব্বতে পরিণত হইবে। এই হিসাবে আলো ছাড়াও উহার সহিত মহব্বতের প্রতিও ইঙ্গিত বুঝা যায়। এখানে আরও একটি ইঙ্গিত এই যে, উহা তাহার নিজের হইবে। অর্থাৎ সূর্যের দ্বারা যদিও সকলেই উপকৃত হয় কিন্তু উহা যদি কাহাকেও দান করিয়া দেওয়া হয়

তবে উহা কত বড় গৌরবের বিষয় হইবে!

হাকেম (রহঃ) হযরত বুরাইদা (রাযিঃ) হইতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ নকল করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি কুরআন শরীফ পড়িবে এবং উহার উপর আমল করিবে তাহাকে একটি নূরের তৈয়ারী মুকুট পরানো হইবে এবং তাহার পিতামাতাকে এমন দুই জোড়া পোশাক পরানো হইবে যে, পুরা দুনিয়া উহার মূল্য পরিশোধ করিতে পারিবে না। তাহারা আরজ করিবে, হে আল্লাহ! এই জোড়া কিসের বদলে দেওয়া হইয়াছে? তখন এরশাদ হইবে, তোমাদের সন্তানদের কুরআন শরীফ পড়ার বদলে।

'জামউল ফাওয়ায়েদ' কিতাবে তাবারানী হইতে নকল করা হইয়াছে, হযরত আনাস (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই এরশাদ বর্ণনা করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি নিজের সন্তানকে কুরআন শরীফ নাজেরা পড়ায়, তাহার আগের ও পরের সকল গোনাহ মাফ হইয়া যায়। আর যে হেফজ করাইবে তাহাকে কিয়ামতের ময়দানে পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উঠানো হইবে এবং তাহার সন্তানকে বলা হইবে, তুমি পড়িতে শুরু কর। সন্তান যখন একটি আয়াত পড়িবে তখন পিতার একটি মর্যাদা উন্নত করা হইবে। এইভাবে সমস্ত কুরআন শরীফ পূর্ণ হইবে।

সন্তান কুরআন শরীফ পড়িলে পিতা এইসব মর্যাদার অধিকারী হইবে। কথা এখানেই শেষ নয়। আর একটি কথাও শুনিয়া রাখুন। খোদা না করুন, যদি আপনার সন্তানকে দুই-চার পয়সার লোভে দ্বীনি এলেম হইতে বঞ্চিত রাখেন তবে শুধু এইটুকুই নয় যে, আপনি চিরস্থায়ী ছওয়াব হইতে মাহরূম থাকিবেন বরং আল্লাহর দরবারে আপনাকে জবাবদিহিও করিতে হইবে। আপনি এই ভয়ে যে, মৌলবী ও হাফেজগণ লেখাপড়ার পর মসজিদের মোল্লা আর মানুষের দয়ার ভিখারী হইয়া যায়; আপনার আদরের সন্তানকে ইহা হইতে বাঁচাইতেছেন। মনে রাখিবেন, উহা দ্বারা আপনি তাহাকে তো চিরস্থায়ী বিপদে ফেলিতেছেনই, সাথে সাথে নিজের উপরও কঠিন জবাবদিহির বোঝা চাপাইয়া লইতেছেন। হাদীস শরীফে আছে—

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الحديث

অর্থাৎ তোমরা প্রত্যেকেই রক্ষক এবং প্রত্যেকে তাহার রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইবে; সুতরাং প্রত্যেকে তাহার অধীনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হইবে যে, তাহাদেরকে কি পরিমাণ দ্বীন শিক্ষা দিয়াছিলে।

হাঁ, ঐ সমস্ত দোষণীয় বিষয় হইতে আপনি নিজেকে এবং

সন্তানদেরকে বাঁচাইবার চেষ্টা করুন ; কিন্তু উকুনের ভয়ে কাপড় না পরা কোন বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তবে কাপড় পরিস্কার রাখার চেষ্টা অবশ্যই করা চাই। মোটকথা, যদি সন্তানকে দ্বীনদারীর যোগ্যতা শিক্ষা দেন তবে আপনি জবাবদিহিতা হইতে রক্ষা পাইবেন। তদুপরি সে যতদিন জীবিত থাকিয়া নেক আমল করিবে এবং আপনার জন্য দোয়া ও এস্তেগফার করিবে—এইগুলি আপনার মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ হইবে। কিন্তু যদি দুনিয়ার খাতিরে সামান্য দু' চার পয়সার লোভে তাহাকে দ্বীনী শিক্ষা হইতে মাহরূম রাখেন তবে শুধু এইটুকুই নয় যে, আপনাকে নিজের কৃতকর্মের ফল ভোগ করিতে হইবে ; বরং তাহার দ্বারা সংঘটিত যাবতীয় অন্যায় আচরণ ও গোনাহের কাজসমূহ আপনার আমলনামায় লিপিবদ্ধ হইবে। আল্লাহর ওয়াস্তে নিজের অবস্থার প্রতি রহম করুন। দুনিয়ার জীবন যে কোন অবস্থায়ই কাটিয়া যাইবে, আর মৃত্যু যে কোন দুঃখ-কষ্ট ও বেদনার পরিসমাপ্তি ঘটাইবে ; কিন্তু যে কষ্টের পর মৃত্যু নাই সেই কষ্টের কোন সীমা নাই।

(১২) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَوْجُعِلَ الْقُرْاٰنُ فِيْ اِهَابٍ ثُمَّ اُلْقِيَ فِي النَّارِ مَا احْتَرَقَ (رواه الدارمي)

عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اگر رکھ دیا جائے قرآن شریف کو کسی چمڑے میں پھر وہ آگ میں ڈال دیا جاوے تو نہ جلے۔

(১২) হযরত উকবা ইবনে আমের (রাযিঃ) বলেন, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই কথা বলিতে শুনিয়াছি যে, যদি কুরআন শরীফকে কোন চামড়ার ভিতর রাখিয়া আগুনে ফেলিয়া দেওয়া হয়, তবে উহা পুড়িবে না। (দারিমী)

মাশায়েখে হাদীস এই রেওয়ায়েতের দুইটি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কেহ কেহ বলিয়াছেন, চামড়া দ্বারা যে কোন জন্তুর চামড়াকে এবং আগুন দ্বারা দুনিয়ার আগুনকেই বুঝানো হইয়াছে। এই অর্থে ইহা একটি বিশেষ মোজেযা। যাহা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানার সহিত খাছ ছিল, যেমন অন্যান্য নবীদের মোজেযা তাহাদের যমানার সহিত খাছ ছিল। দ্বিতীয় অর্থ হইল, চামড়ার দ্বারা মানুষের চামড়া এবং আগুন দ্বারা জাহান্নামের আগুন বুঝানো হইয়াছে। এই অর্থে হুকুমটি ব্যাপক হইবে ; কোন যমানার সহিত খাছ হইবে না। অর্থাৎ যে ব্যক্তি কুরআনের হাফেজ হইবে তাহাকে যদি কোন অন্যায়ের কারণে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয় তবুও আগুন তাহার উপর কোন ক্রিয়া করিবে না। অন্য

রেওয়ায়াতে مَا مَسَّتْهُ النَّارُ শব্দটিও আসিয়াছে। অর্থাৎ আগুন তাহাকে স্পর্শও করিবে না।

মোল্লা আলী কারী (রহঃ) শরহুস্‌সুন্নাহ কিতাব হইতে আবূ উমামা (রাযিঃ)এর যে রেওয়ায়াতটি নকল করিয়াছেন, উহাও এই দ্বিতীয় অর্থকে সমর্থন করে। যাহার তরজমা হইল, তোমরা কুরআন শরীফ হেফজ করিতে থাক। কারণ, যে অন্তরে কালামে পাক রক্ষিত থাকে, আল্লাহ তায়ালা ঐ অন্তরকে শাস্তি দিবেন না। এই হাদীস উক্ত বিষয়ে অত্যন্ত পরিস্কার ও সুস্পষ্ট।

যাহারা কুরআন হেফজ করাকে অনর্থক মনে করেন, তাহারা আল্লাহর ওয়াস্তে এই সব ফযীলতের উপর একটু চিন্তা করুন। এই এক ফযীলতই এমন, যাহার দরুন প্রত্যেক ব্যক্তিকে কুরআন শরীফ হেফজ করার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়া দেওয়া উচিত। কারণ, এমন কে আছে, যে গোনাহ করে নাই এবং সেই কারণে আগুনের উপযুক্ত হইবে না।

'শরহে এহ্‌ইয়া' কিতাবে ঐ সকল লোকের তালিকায় যাহাদেরকে কিয়ামতের ভয়াবহ দিনে আরশের নীচে স্থান দেওয়া হইবে 'দায়লামী' বর্ণিত হযরত আলী (রাযিঃ)এর হাদীস হইতে নকল করা হইয়াছে যে, 'হামেলীনে কুরআন' অর্থাৎ হাফেজগণ আল্লাহর আরশের ছায়ায় আম্বিয়ায়ে কেরাম ও মাহবূব বান্দাগণের সঙ্গে থাকিবে।

(১৩) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَظْهَرَهٗ فَاَحَلَّ حَلَالَهٗ وَحَرَّمَ حَرَامَهٗ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ وَشَفَّعَهٗ فِيْ عَشَرَةٍ مِّنْ اَهْلِ بَيْتِهٖ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ (رواه احمد والترمذی وقال هذا حديث غريب وحفص بن سليمان الراوی ليس هو بالقوی يضعف فی الحديث ورواه ابن ماجة والدارمی)

حضرت علیؓ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جس شخص نے قرآن پڑھا پھر اس کو حفظ یاد کیا اور اس کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام، حق تعالیٰ شانہٗ اس کو جنت میں داخل فرماویں گے اور اس کے گھرانے میں سے ایسے دس آدمیوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول فرماویں گے جن کے لئے جہنم واجب ہو چکی ہو۔

(১৩) হযরত আলী (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ নকল করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি কুরআন পড়িল অতঃপর উহা

হেফজ ইয়াদ করিল এবং উহার হালালকে হালাল ও হারামকে হারাম জানিল, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে জান্নাতে দাখেল করিবেন এবং তাহার পরিবারের এমন দশজন লোকের জন্য তাহার সুপারিশ কবূল করিবেন, যাহাদের জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হইয়া গিয়াছে।

(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, আহমদ, দারিমী)

ইনশাআল্লাহ প্রত্যেক মুমিন জান্নাতে প্রবেশ করিবেই যদিও বদ আমলের শাস্তি ভোগ করিয়া হউক না কেন। কিন্তু হাফেজদের ফযীলত হইল তাহারা প্রথম হইতেই জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি পাইবেন। আর ফাসেক ফাজের কবীরা গোনাহে লিপ্ত দশ ব্যক্তির জন্য তাহাদের সুপারিশ কবূল করা হইবে। কাফেরদের জন্য নয় ; কেননা, তাহাদের জন্য কোন সুপারিশ নাই। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰهُ النَّارُ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহর সহিত শরীক করে, আল্লাহ তাহার উপর জান্নাতকে হারাম করিয়া দিয়াছেন এবং তাহার ঠিকানা হইল জাহান্নাম। আর জালেমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নাই। (সূরা মায়িদা, আয়াত ঃ ৭২)

অন্যত্র এরশাদ হইয়াছে—

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ

অর্থাৎ, নবী এবং মুমিনদের পক্ষে মুশরিকদের জন্য ক্ষমা চাহিবার কোন অধিকার নাই ; যদিও তাহারা আত্মীয় হয়।(সূরা তওবা,আয়াতঃ ১১৩)

কুরআনের আয়াত এই বিষয়ে পরিষ্কার যে, মুশরিকদের জন্য কোন ক্ষমা নাই। কাজেই বুঝা গেল, হাফেজদের সুপারিশ বলিতে ঐ সকল মুসলমানদের জন্য সুপারিশ বুঝানো হইয়াছে, যাহাদের গোনাহের কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করা জরুরী হইয়া গিয়াছিল। যাহারা জাহান্নাম হইতে রক্ষা পাইতে চায় তাহারা যদি নিজেরা হাফেজ না হইয়া থাকে, এখন হেফজ করাও যদি তাহাদের জন্য সম্ভবপর না হয়, তবে অন্ততপক্ষে নিজের কোন নিকট আত্মীয়কে হাফেজ বানানো উচিত। যেন তাহার ওসীলায় সে নিজের বদ আমলের শাস্তি হইতে রক্ষা পাইতে পারে। আল্লাহ তায়ালার কত বড় মেহেরবানী ঐ ব্যক্তির উপর, যাহার বাপ, চাচা, দাদা, নানা, মামা সকলেই হাফেজ। হে আল্লাহ ! আপনি এই নেয়ামত আরও বাড়াইয়া দিন। (স্বয়ং লেখক সেই খান্দানের একজন।)

(١٤) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَلَّمُوا الْقُرْاٰنَ فَاقْرَءُوْهُ فَاِنَّ مَثَلَ الْقُرْاٰنِ لِمَنْ تَعَلَّمَ فَقَرَاَ وَقَامَ بِهٖ كَمَثَلِ جِرَابٍ مَحْشُوٍّ مِسْكًا تَفُوْحُ رِيْحُهٗ كُلَّ مَكَانٍ وَمَثَلُ مَنْ تَعَلَّمَهٗ فَرَقَدَ وَهُوَ فِىْ جَوْفِهٖ كَمَثَلِ جِرَابٍ اُوْكِىَ عَلٰى مِسْكٍ. (رواه الترمذى والنسائى وابن ماجة وابن حبان)

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ قرآن شریف کو سیکھو پھر اس کو پڑھو۔ اس لئے کہ جو شخص قرآن شریف سیکھتا ہے اور پڑھتا ہے اور تہجد میں اس کو پڑھتا رہتا ہے اس کی مثال اس تھیلی کی سی ہے جو مشک سے بھری ہوئی ہو کہ اس کی خوشبو تمام مکان میں پھیلتی ہے اور جس شخص نے سیکھا اور پھر سو گیا اس کی مثال اس مشک کی تھیلی کی ہے جس کا منہ بند کر دیا گیا ہو۔

(১৪) হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা কুরআন শিক্ষা কর অতঃপর উহা তেলাওয়াত কর। কেননা, যে ব্যক্তি কুরআন শিক্ষা করে ও তেলাওয়াত করে এবং তাহাজ্জুদ নামাযে পড়িতে থাকে, তাহার দৃষ্টান্ত ঐ থলির মত যাহা মেশ্‌কের দ্বারা ভরপুর ; উহার খোশবু সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। আর যে ব্যক্তি কুরআন শিক্ষা করিল এবং রাত্রে ঘুমাইয়া কাটাইয়া দিল তাহার দৃষ্টান্ত মেশ্‌কের ঐ থলির মত যাহার মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কুরআনে পাক শিক্ষা করিল এবং উহার যত্ন করিল, রাত্রের নামাযে তেলাওয়াত করিল, তাহার দৃষ্টান্ত সেই মেশ্‌কের পাত্রের মত যাহার মুখ খোলা রহিয়াছে এবং খোশবুতে সারা ঘর মোহিত হয়। তদ্রূপ হাফেজের তেলাওয়াতের দরুন সমস্ত ঘর নূর ও বরকতে ভরপুর থাকে। আর যদি হাফেজ রাতে ঘুমাইয়া থাকে বা গাফলতির কারণে তেলাওয়াত না করে, তবুও তাহার অন্তরে যে কালামে পাক রহিয়াছে উহা সর্বাবস্থায় মেশ্‌ক। এই গাফলতির কারণে ক্ষতি এই হইল যে, অন্যান্য লোকেরা উহার বরকত হইতে মাহরূম রহিল। কিন্তু তাহার অন্তর তো এই মেশ্‌ককে নিজের ভিতরে ধারণ করিয়াই রাখিয়াছে।

(তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান)

(١٥) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الَّذِىْ لَيْسَ فِىْ جَوْفِهٖ شَىْءٌ مِّنَ الْقُرْاٰنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ ۔
(رواه الترمذى وقال هذا حديث صحيح ورواه الدارمى والحاكم وصححه)

عبداللہ بن عباسؓ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جس شخص کے قلب میں قرآن شریف کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہیں وہ بمنزلہ ویران گھر کے ہے۔

(১৫) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তির অন্তরে কুরআনের কোন অংশই রক্ষিত নাই, উহা বিরান ঘরের মত।

(তিরমিযী, দারিমী, হাকিম)

বিরান ঘরের সহিত তুলনার মধ্যে একটি বিশেষ রহস্য রহিয়াছে। خانهٔ خالی را دیو مے گیرد বিরান ঘর যেমন জিন–ভূত দখল করিয়া লয় তদ্রূপ কালামে পাক হইতে শূন্য অন্তরকে শয়তান দখল করিয়া লয়। এই হাদীসে হিফজের কত তাকীদ করা হইয়াছে যে, যে অন্তরে কালামে পাক রক্ষিত নাই উহাকে বিরান ঘর বলা হইয়াছে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন, যে ঘরে কুরআন মজীদ পড়া হয় তাহাদের সন্তান–সন্ততি বৃদ্ধি পায় এবং খায়র–বরকত বাড়িয়া যায়। সেই ঘরে ফেরেশতা অবতরণ করে এবং শয়তান সেই ঘর হইতে বাহির হইয়া যায়। আর যে ঘরে কুরআন তেলাওয়াত হয় না সেই ঘরে অভাব ও বে–বরকতি দেখা দেয়। ফেরেশতা সেই ঘর হইতে চলিয়া যায় এবং শয়তান ঢুকিয়া পড়ে। হযরত ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে এবং কেহ কেহ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন যে, খালি ঘর উহাকে বলে, যেখানে কুরআন তেলাওয়াত হয় না।

(١٦) عَنْ عَائِشَةَؓ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قِرَاءَةُ الْقُرْاٰنِ فِى الصَّلٰوةِ اَفْضَلُ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْاٰنِ فِىْ غَيْرِ الصَّلٰوةِ وَقِرَاءَةُ الْقُرْاٰنِ فِىْ غَيْرِ الصَّلٰوةِ اَفْضَلُ مِنَ التَّسْبِيْحِ وَ التَّكْبِيْرِ وَالتَّسْبِيْحُ اَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ

وَالصَّدَقَةُ اَفْضَلُ مِنَ الصَّوْمِ وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ مِّنَ النَّارِ (رواه البيهقى فى شعب الايمان)

حضرت عائشہؓ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ نماز میں قرآن شریف کی تلاوت بغیر نماز کی تلاوت سے افضل ہے اور بغیر نماز کی تلاوت تسبیح وتکبیر سے افضل ہے اور تسبیح صدقہ سے افضل ہے اور صدقہ روزہ سے افضل ہے اور روزہ بچاؤ ہے آگ سے۔

(১৬) হযরত আয়েশা (রাযিঃ) হইতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণিত আছে যে, নামাযের ভিতর কুরআন তেলাওয়াত করা নামাযের বাহিরে তেলাওয়াত করা হইতে উত্তম। আর নামাযের বাহিরে তেলাওয়াত করা তসবীহ এবং তকবীর হইতে উত্তম। আর তসবীহ পড়া ছদকা হইতে উত্তম। আর ছদকা রোযা হইতে উত্তম। আর রোযা দোযখ হইতে বাঁচিবার জন্য ঢালস্বরূপ। (বায়হাকী ঃ শুয়াব)

কুরআন তেলাওয়াত যিকির হইতে উত্তম হওয়ার বিষয়টি খুবই স্পষ্ট। কারণ, ইহা আল্লাহ তায়ালার কালাম। আর ইহা পূর্বেই জানা গিয়াছে যে, অন্যান্য কালামের উপর আল্লাহ তায়ালার কালামের ফযীলত এইরূপ যেরূপ স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার ফযীলত সমস্ত মখলূকের উপর। আল্লাহর যিকির ছদকা হইতে উত্তম হওয়ার বিষয়টি অন্যান্য রেওয়ায়াতেও আসিয়াছে। ছদকা রোযা হইতে উত্তম, যাহা এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায় ; কিন্তু অপর কিছু রেওয়ায়াত দ্বারা ইহার বিপরীত অর্থাৎ রোযা উত্তম বুঝা যায়। আসলে এই পার্থক্য অবস্থাভেদে হইবে। কোন অবস্থায় রোযা উত্তম হইবে। আর কোন অবস্থায় ছদকা উত্তম হইবে। এমনিভাবে ব্যক্তি হিসাবেও পার্থক্য হইবে। কোন কোন লোকের জন্য রোযা উত্তম। এই হাদীসে বর্ণিত সর্বনিম্ন স্তরের আমল রোযাই যখন দোযখ হইতে বাঁচিবার ঢালস্বরূপ, তখন সর্বোচ্চ আমল কুরআন তেলাওয়াতের ফযীলত কী হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়।

ইমাম গায্যালী (রহঃ) 'এহ্ইয়াউল উলূম' কিতাবে হযরত আলী (রাযিঃ) হইতে নকল করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি নামাযে দাঁড়াইয়া কুরআন পড়িল সে প্রতি হরফে একশত নেকী পাইবে, যে ব্যক্তি নামাযে বসিয়া পড়িল সে প্রতি হরফে পঞ্চাশ নেকী পাইবে, যে নামাযের বাহিরে ওযূর সহিত পড়িল সে পঁচিশ নেকী পাইবে, আর যে ওযূ ছাড়া পড়িল সে দশ নেকী পাইবে, আর যে নিজে পড়ে নাই কিন্তু কান লাগাইয়া কুরআন তেলাওয়াত শুনিয়াছে সেও প্রতি হরফের বদলে একটি করিয়া নেকী পাইবে।

(١٧) عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ
رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اِذَا رَجَعَ اِلٰى اَهْلِهٖ
اَنْ يَّجِدَ فِيْهِ ثَلٰثَ خَلِفَاتٍ
عِظَامٍ سِمَانٍ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ فَثَلٰثُ
اٰيَاتٍ يَقْرَأُ بِهِنَّ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلٰوتِهٖ
خَيْرٌ لَّهٗ مِنْ ثَلٰثِ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ
سِمَانٍ (رواه مسلم)

اَبُوْ ہُرَیْرہ رضؓ کہتے ہیں کہ حضورِ اقدس صَلَّی اللّٰہُ
عَلَیْہِ وَسَلَّمَ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی پسند
کرتا ہے کہ جب گھر واپس آئے تو تین اونٹنیاں
حاملہ بڑی اور موٹی اس کو مل جاویں. ہم نے
عرض کیا کہ بے شک (ضرور پسند کرتے ہیں)
حضورؐ نے فرمایا کہ تین آیتیں جن کو تم میں
سے کوئی نماز میں پڑھ لے. وہ تین حاملہ
بڑی اور موٹی اونٹنیوں سے افضل ہیں.

(১৭) হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, তোমাদের মধ্যে কেহ কি ইহা পছন্দ করে যে, সে বাড়ীতে ফিরিয়া তিনটি বড় ধরনের মোটা তাজা গর্ভবতী উটনী পাইয়া যাইবে? আমরা আরজ করিলাম, অবশ্যই আমরা ইহা পছন্দ করি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কেহ যদি নামাযে তিনটি আয়াত তেলাওয়াত করে, তবে উহা তিনটি মোটা-তাজা গর্ভবতী উটনী হইতে উত্তম। (মুসলিম)

তিন নম্বর হাদীসে প্রায় অনুরূপ বিষয়বস্তু বর্ণিত হইয়াছে। তবে পূর্বের হাদীসে নামাযের বাহিরে পড়ার আর এই হাদীসে নামাযের ভিতরে পড়ার ফযীলত বর্ণিত হইয়াছে। নামাযের বাহিরে পড়ার চেয়ে ভিতরে পড়া যেহেতু উত্তম, তাই এখানে গর্ভবতী উটনীর উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। এখানে এবাদতও যেমন দুইটি অর্থাৎ নামায ও তেলাওয়াত, তেমনি নেয়ামতও দুইটির কথা বলা হইয়াছে অর্থাৎ উটনী এবং দ্বিতীয়টি উহা গর্ভবতী হওয়া। তিন নম্বর হাদীসের ফায়দায় লেখা হইয়াছে যে, এই ধরনের হাদীসের দ্বারা কেবল বুঝানোর জন্যই উপমা দেওয়া হয়। নতুবা একটি আয়াতের চিরস্থায়ী ছওয়াব হাজারো ক্ষণস্থায়ী উটনী হইতে উত্তম।

(١٨) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ
اَوْسٍ الثَّقَفِیِّ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ
اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِرَاءَةُ
الرَّجُلِ الْقُرْاٰنَ فِىْ غَيْرِ الْمُصْحَفِ
اَلْفُ دَرَجَةٍ وَقِرَاءَتُهٗ فِى الْمُصْحَفِ
تُضَعَّفُ عَلٰى ذٰلِكَ اِلٰى اَلْفَىْ دَرَجَةٍ.
(رواه البيهقى فى شعب الايمان)

اوس ثقفیؓ نے حضورِ اقدس صلی اللّٰہ علیہ وسلم
سے نقل کیا ہے کہ کلامُ اللّٰہ شریف کا حفظ
پڑھنا ہزار درجہ ثواب رکھتا ہے اور قرآن
پاک میں دیکھ کر پڑھنا دو ہزار تک بڑھ
جاتا ہے.

(১৮) হযরত আউস ছাকাফী (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ নকল করিয়াছেন যে, কুরআন শরীফ মুখস্থ পড়িলে একহাজার গুণ ছওয়াব হয় আর দেখিয়া পড়িলে দুই হাজার গুণ পর্যন্ত ছওয়াব বৃদ্ধি পায়। (বায়হাকী ঃ শুয়াব)

হাফেজে কুরআনের বিভিন্ন ফযীলত পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। এই হাদীসে দেখিয়া পড়ার ফযীলত এই জন্য আসিয়াছে যে, কুরআন শরীফ দেখিয়া পড়ার মধ্যে চিন্তা-ফিকির বেশী করা যায়। আবার ইহাতে কয়েকটি এবাদত একসাথে হয়, যথা—কুরআনে পাক দেখা, কুরআনে পাক হাতে স্পর্শ করা ইত্যাদি। এই জন্যই দেখিয়া পড়া উত্তম। তবে কোন কোন রেওয়ায়াতে মুখস্থ পড়াকে উত্তম বলা হইয়াছে, তাই ওলামায়ে কেরামের মধ্যেও এই ব্যাপারে মতভেদ দেখা দিয়াছে যে, কালামে পাক মুখস্থ পড়া উত্তম নাকি দেখিয়া পড়া উত্তম। এক জামাতের রায় হইল, উপরোক্ত হাদীসের কারণে কুরআন শরীফ দেখিয়া পড়া উত্তম। কারণ ইহাতে ভুল পড়া হইতে বাঁচিয়া থাকা যায় এবং কুরআনের উপর নজর থাকে। অন্যান্য রেওয়ায়াতের কারণে আরেক জামাত মুখস্থ পড়াকে প্রাধান্য দেন। কারণ ইহাতে খুশু ও মনোযোগ বেশী হয় এবং রিয়া থাকে না, তদুপরি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরও মুখস্থ পড়ার অভ্যাস ছিল।

ইমাম নববী (রহঃ) ইহার ফায়সালা দিয়াছেন যে, মানুষের অবস্থা হিসাবে ফযীলত বিভিন্ন হইবে। দেখিয়া পড়িলে যাহার মনোযোগ ও চিন্তা-ফিকির বেশী হয় তাহার জন্য দেখিয়া পড়া উত্তম। আর মুখস্থ পড়িলে যাহার মনোযোগ ও চিন্তা-ফিকির বেশী হয় তাহার জন্য মুখস্থ পড়া উত্তম।

হাফেজ ইবনে হজর (রহঃ)ও 'ফতহুল বারী' নামক কিতাবে এই ব্যাখ্যাটিকেই পছন্দ করিয়াছেন। কথিত আছে, অধিক পরিমাণে তেলাওয়াতের কারণে হযরত ওসমান (রাযিঃ)এর নিকট দুই জিল্দ কুরআন শরীফ ছিড়িয়া গিয়াছিল। 'শরহে এহ্ইয়া' কিতাবে আমর ইবনে মাইমূন (রহঃ) নকল করিয়াছেন, যে ব্যক্তি ফজরের নামায পড়িয়া

কুরআন শরীফ খুলে এবং একশত আয়াত তেলাওয়াত করে তাহার আমলনামায় সমগ্র দুনিয়া পরিমাণ ছওয়াব লেখা হয়। কুরআন শরীফ দেখিয়া পড়া দৃষ্টিশক্তির জন্য উপকারী বলা হয়। আবু উবাইদা (রাযিঃ) এক হাদীসে মুসাল্‌সাল নকল করিয়াছেন, উহার প্রত্যেক বর্ণনাকারী বলিয়াছেন যে, আমার চোখের অসুখ ছিল, এইজন্য আমার উস্তাদ কুরআন শরীফ দেখিয়া পড়িতে বলিয়াছেন। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) অনেক সময় এশার নামাযের পর কুরআন শরীফ খুলিতেন এবং ফজরের নামাযের সময় উহা বন্ধ করিতেন।

(১৯) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ هٰذِهِ الْقُلُوْبَ تَصْدَأُ كَمَا يَصْدَأُ الْحَدِيْدُ اِذَا اَصَابَهُ الْمَاءُ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا جِلَاؤُهَا قَالَ كَثْرَةُ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَتِلَاوَةُ الْقُرْاٰنِ (رواه البيهقى فى شعب الايمان)

عبداللہ بن عمرؓ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسا کہ لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے پوچھا گیا کہ حضورؐ ان کی صفائی کی کیا صورت ہے. آپؐ نے فرمایا کہ موت کو اکثر یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا.

(১৯) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মানুষের অন্তরেও মরিচা পড়িয়া যায় যেমন লোহাতে পানি পাওয়ার কারণে মরিচা পড়িয়া যায়। জিজ্ঞাসা করা হইল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহা পরিষ্কার করার উপায় কি? তিনি বলিলেন, মৃত্যুকে বেশী করিয়া স্মরণ করা এবং কুরআন পাকের তেলাওয়াত করা। (বায়হাকী ঃ শুআব)

অর্থাৎ অতি মাত্রায় গোনাহ করিলে এবং আল্লাহর যিকির হইতে গাফেল থাকিলে অন্তরেও মরিচা পড়িয়া যায়, যেমন লোহাতে পানি লাগিলে মরিচা পড়িয়া যায়। কুরআন তেলাওয়াত ও মৃত্যুর স্মরণ উহা পরিষ্কারের জন্য রেতের কাজ করে। অন্তর আয়নার মত, উহা যত ময়লাযুক্ত হইবে মারেফতের প্রতিফলন ততই কম হইবে। পক্ষান্তরে উহা যে পরিমাণ পরিষ্কার ও স্বচ্ছ হইবে সেই পরিমাণ উহাতে মারেফতের প্রতিফলন স্পষ্ট হইবে। এই কারণে মানুষ যে পরিমাণ গোনাহ ও শয়তানী কার্যকলাপে লিপ্ত হইবে, সেই পরিমাণ আল্লাহর মারেফত হইতে দূরে থাকিবে। অন্তর নামক এই আয়নাকে পরিষ্কার করার জন্য মাশায়েখগণ

রিয়াজত-মুজাহাদা, যিকির-আযকার ও শুগলের ছবক দিয়া থাকেন। হাদীসে আছে, যখন বান্দা গোনাহ করে তখন তাহার অন্তরে একটি কাল দাগ পড়িয়া যায়। যদি সে খালেছ তওবা করে তবে কাল দাগটি মিটিয়া যায়। আর যদি আরও একটি গোনাহ করে তবে আরও একটি দাগ পড়িয়া যায়। এইভাবে একের পর এক গোনাহ করিতে থাকিলে একের পর এক দাগসমূহ দ্বারা অন্তর একেবারে কাল হইয়া যায়। অতঃপর এই অন্তরে আর ভাল কাজের প্রতি কোন আগ্রহই থাকে না। বরং মন্দ কাজের প্রতিই তাহার আকর্ষণ বাড়িয়া যায়। আয় আল্লাহ! এই অবস্থা হইতে আমাদেরকে হেফাজত করুন। কুরআন পাকের এই আয়াতে এই দিকেই ইঙ্গিত করা হইয়াছে— كَلَّا بَلْ سكتة رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ অর্থাৎ, নিশ্চয় তাহাদের বদআমলসমূহ তাহাদের অন্তরে মরিচা জমাইয়া দিয়াছে। (সূরা মুতাফ্‌ফিফীন, আয়াত ঃ ১৪)

আরেক হাদীসে আছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমি তোমাদের মধ্যে দুইজন উপদেশদাতা রাখিয়া গেলাম। একটি কথা বলে অপরটি চুপ থাকে। প্রথমটি কুরআন শরীফ আর দ্বিতীয়টি মৃত্যুর স্মরণ। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী শিরধার্য, কিন্তু উপদেশদাতা তাহার জন্যই হইবে, যে উপদেশ কবূল করে এবং উপদেশের প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করে। কিন্তু যে ক্ষেত্রে দ্বীন-ধর্মকেই অনর্থক ও উন্নতির পথে বাধা মনে করা হয়, সেক্ষেত্রে উপদেশের প্রয়োজনই বা কাহার, আর উপদেশই বা কি কাজে আসিবে?

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, পূর্বেকার লোকেরা কুরআন শরীফকে আল্লাহর ফরমান মনে করিত, রাতভর উহার মধ্যে চিন্তা-ভাবনা করিত, আর দিনের বেলায় উহার উপর আমল করিত। কিন্তু তোমরা উহার হরফ ও যের-যবরকে তো খুবই দুরস্ত করিতেছ, কিন্তু উহাকে শাহী ফরমান মনে কর না এবং উহার মধ্যে চিন্তা-ফিকির কর না।

(২০) عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ شَرَفًا يَتَبَاهَوْنَ بِهٖ وَاِنَّ بَهَاءَ اُمَّتِىْ وَشَرَفَهَا الْقُرْاٰنُ (رواه فى الحلية)

حضرت عائشہؓ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتی ہیں کہ ہر چیز کے لئے کوئی شرافت و افتخار ہوا کرتا ہے جس سے وہ تفاخر کیا کرتا ہے. میری امت کی رونق اور افتخار قرآن شریف ہے

(২০) হযরত আয়েশা (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন যে, প্রত্যেক জিনিসের জন্য কোন না কোন গর্ব ও মর্যাদার বিষয় থাকে, যাহা দ্বারা সে গর্ব করিয়া থাকে। আমার উম্মতের গর্ব ও মর্যাদার বিষয় হইল কুরআন শরীফ। (হিল্‌য়াতুল-আওলিয়া)

অর্থাৎ মানুষ নিজেদের বাপ-দাদা, খান্দান এবং এইরূপ আরও অনেক বিষয়ের দ্বারা নিজেদের মর্যাদা ও বড়াই প্রকাশ করিয়া থাকে। আর আমার উম্মতের গৌরবের বস্তু হইল আল্লাহর কালাম। কেননা ইহা পড়া, ইয়াদ করা, অন্যকে পড়ানো, ইহার উপর আমল করা ইত্যাদি সবই গৌরবের বিষয়। কেনই বা হইবে না, ইহা তো মাহবুবের কালাম, মনিবের ফরমান, দুনিয়ার বড় হইতে বড় কোন মর্যাদাই উহার সমান হইতে পারে না। ইহা ছাড়া দুনিয়ার যত মর্যাদা ও গুণাবলী আছে, উহা আজ নহে কাল অবশ্যই শেষ হইয়া যাইবে। কিন্তু কালামে পাকের মর্যাদা ও সম্মান চিরদিন থাকিবে ; কখনও শেষ হইবে না। কুরআন শরীফের ছোট ছোট গুণাবলীও এইরূপ যে, উহার একটিও গৌরব করার জন্য যথেষ্ট। অথচ উহার মধ্যে সব গুণাবলীই পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। যেমন উহার সুন্দর গ্রন্থনা, চমৎকার প্রকাশভঙ্গি, শব্দের পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্ক, বাক্যের অনুপম বিন্যাস, অতীত ও ভবিষ্যত ঘটনাবলীর বিবরণ, লোকদের সম্পর্কে এমন সমালোচনা যে, তাহারা মিথ্যা প্রমাণ করিতে চাহিলেও করিতে পারিবে না, যেমন ইহুদীদের আল্লাহর মহব্বতের দাবীদার হওয়া সত্ত্বেও মৃত্যুর আকাঙ্খা করিতে না পারা, শ্রবণকারীর মন প্রভাবিত হওয়া, তেলাওয়াতকারী কখনও বিরক্ত না হওয়া ; অথচ অন্য সব কালাম—উহা যতই মনমাতানো হউক না কেন, প্রিয়তমের পাগল করনেওয়ালা পত্রই হউক না কেন দিনে দশ বার পড়িলে মন বিরক্ত না হইলেও বিশ বার পড়িলে নিশ্চয় বিরক্তির উদ্রেক হইবে। বিশ বার পড়িলেও যদি বিরক্তি না আসে তবে চল্লিশ বারে অবশ্যই আসিবে। মোটকথা কোন না কোন সময় বিরক্তি আসিবেই। কিন্তু কালামে পাকের একটি রুকু ইয়াদ করুন, দুইশত বার পড়ুন, চারশত বার পড়ুন, সারা জীবন পড়িতে থাকুন কখনও বিরক্তি আসিবে না। যদি কোন অসুবিধা দেখা দেয় তবে উহা নিতান্তই সাময়িক হইবে এবং অতি শীঘ্রই দূর হইয়া যাইবে। যত বেশী পড়িতে থাকিবেন ততই আনন্দ ও স্বাদ বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। এই সব বিষয় এমন যে, কোন মানুষের কথার মধ্যে যদি উহার একটিও সামান্য মাত্রায় পাওয়া যায় তবুও উহার উপর কতই না গৌরব করা হয়। অতএব যে কালামে পাকে এইসব গুণাবলী পূর্ণমাত্রায় রহিয়াছে উহা কত গৌরবের

বস্তু হইবে! ইহার পর আমাদের অবস্থার উপর একটু চিন্তা করি। আমাদের মধ্যে কতজন আছেন যাহারা স্বয়ং হাফেজে কুরআন হওয়ার উপর গৌরব বোধ করেন অথবা আমাদের দৃষ্টিতে অন্য কাহারো হাফেজে কুরআন হওয়া সম্মান ও মর্যাদার বিষয় কিনা। আজ আমাদের সম্মান ও গৌরবের বিষয় হইল উচুঁ উচুঁ ডিগ্রী, বড় বড় উপাধি, দুনিয়ার যশ-খ্যাতি, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও মৃত্যুর পর হাতছাড়া হইয়া যাইবে এমন ধন-সম্পদ।

(٢١) عَنْ اَبِیْ ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ یَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَوْصِنِیْ قَالَ عَلَیْكَ بِتَقْوَی اللّٰهِ فَاِنَّهٗ رَاْسُ الْاَمْرِ كُلِّهٖ قُلْتُ یَارَسُوْلَ اللّٰهِ زِدْنِیْ قَالَ عَلَیْكَ بِتِلَاوَةِ الْقُرْاٰنِ فَاِنَّهٗ نُوْرٌ لَّكَ فِی الْاَرْضِ وَذُخْرٌ لَّكَ فِی السَّمَاءِ۔

رواه ابن حبان فی صحیحه فی حدیث طویل،

ابوذرؓ کہتے ہیں کہ میں نے حضورؐ سے درخواست کی کہ مجھے کچھ وصیّت فرمائیں۔ حضورؐ نے فرمایا، تقویٰ کا اہتمام کرو کہ تمام اُمور کی جڑ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس کے ساتھ کچھ اور بھی ارشاد فرماویں تو حضورؐ نے فرمایا کہ تلاوتِ قرآن کا اہتمام کرو کہ دنیا میں یہ نور ہے اور آخرت میں ذخیرہ۔

(২১) হযরত আবূ যর গিফারী (রাযিঃ) বলেন, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দরখস্ত করিলাম যে, আমাকে কিছু নসীহত করুন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, তাকওয়া অবলম্বন কর, কারণ উহা সমস্ত নেক আমলের মূল। আমি আরজ করিলাম, আরও কিছু নসীহত করুন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, কুরআন তেলওয়াতের এহ্‌তেমাম কর। কারণ উহা দুনিয়াতে তোমার জন্য নূর এবং আখেরাতে সঞ্চিত ধনভাণ্ডার।

(ইবনে হিব্বান)

প্রকৃতপক্ষে তাকওয়া বা পরহেজগারীই হইল সমস্ত কাজের মূল। যে অন্তরে আল্লাহর ভয় পয়দা হইয়া যাইবে তাহার দ্বারা কোন গোনাহ হইতে পারে না এবং তাহার কোন অভাব দেখা দিবে না।

وَمَنْ یَّتَّقِ اللّٰهَ یَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا وَّیَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُ

'যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তায়ালা যে কোন সংকটে তাহার জন্য রাস্তা বাহির করিয়া দেন এবং এমনভাবে তাহাকে রিযিক পৌঁছাইয়া দেন যাহা তাহার ধারণাও হয় না।' (সূরা তালাক, আয়াত ঃ ২)

কুরআন তেলাওয়াত যে নূর উহা পূর্বের রেওয়ায়াতসমূহ দ্বারাও জানা গিয়াছে। 'শরহে এহ্ইয়া' কিতাবে 'মারেফতে আবূ নুআঈম' হইতে নকল করা হইয়াছে যে, হযরত বাসেত (রহঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই এরশাদ উল্লেখ করিয়াছেন যে, যে সমস্ত ঘরে কুরআন তেলাওয়াত করা হয় আসমানওয়ালাদের নিকট সেইগুলি এমনভাবে চমকাইতে থাকে, যেমন জমিনওয়ালাদের নিকট আসমানের তারাসমূহ চমকাইতে থাকে। এই হাদীসটি তারগীব ও অন্যান্য কিতাবে সংক্ষেপে এইটুকুই নকল করা হইয়াছে। আসল দীর্ঘ রেওয়ায়াতটি ইবনে হিব্বান ও অন্যান্য কিতাব হইতে মোল্লা আলী কারী (রহঃ) বিস্তারিতভাবে এবং আল্লামা সুয়ূতী (রহঃ) কিছুটা সংক্ষিপ্তভাবে নকল করিয়াছেন। উপরে যতটুকু অংশ উল্লেখ করা হইয়াছে উহা যদিও আমাদের এই কিতাবের জন্য মুনাসিব ; কিন্তু সম্পূর্ণ হাদীসটি খুবই জরুরী ও উপকারী অনেকগুলি বিষয় সম্বলিত হওয়ার কারণে সম্পূর্ণ হাদীসই ব্যাখ্যাসহ নকল করা হইতেছে।

হযরত আবূ যর গিফারী (রাযিঃ) বলেন, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আল্লাহ তায়ালা মোট কতগুলি কিতাব নাযিল করিয়াছেন? তিনি এরশাদ করিলেন, একশত ছহীফা এবং চারটি কিতাব। হযরত শীছ (আঃ)এর উপর পঞ্চাশটি, হযরত ইদরীস (আঃ)এর উপর ত্রিশটি, হযরত ইবরাহীম (আঃ)এর উপর দশটি এবং তাওরাত নাযিল হওয়ার পূর্বে হযরত মূসা (আঃ)এর উপর দশটি ছহীফা নাযিল করিয়াছিলেন। এইগুলি ছাড়া তাওরাত, ইঞ্জীল, যবূর ও কুরআন এই চারটি কিতাব নাযিল করিয়াছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হযরত ইবরাহীম (আঃ)এর ছহীফাসমূহে কি ছিল? তিনি এরশাদ করিলেন, সব শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত ছিল। যেমন, হে অত্যাচারী ও অহংকারী বাদশাহ! আমি তোমাকে এই জন্য পাঠাই নাই যে, তুমি শুধু ধন-সম্পদ জমা করিবে। আমি তোমাকে এই জন্য পাঠাইয়াছিলাম যে, কোন মজলুমের ফরিয়াদ যেন আমার পর্যন্ত পৌঁছিতে না দাও ; আমার নিকট পৌঁছার পূর্বেই তুমি উহার ব্যবস্থা করিয়া দিবে। কেননা মজলুম কাফের হইলেও আমি তাহার ফরিয়াদকে রদ করি না।

আমি অধম (লেখক) বলিতেছি, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন সাহাবীকে কোন এলাকার আমীর বা শাসনকর্তা বানাইয়া পাঠাইতেন তখন অন্যান্য নসীহতের সহিত অত্যন্ত এহ্তেমামের সাথে ইহাও বলিতেন যে, 'সাবধান! মজলুমের বদদোয়া হইতে বাঁচিয়া

থাক। কেননা, মজলুমের বদ-দোয়া ও আল্লাহর দরবারের মধ্যে কোন পর্দা থাকে না।' (কবি বলিয়াছেন—)

بترس از آہِ مظلوماں کہ ہنگامِ دعا کردن   اجابت از درِ حق بہرِ استقبال می آید

অর্থাৎ, মজলুম ও নিপীড়িত মানুষের আহ্ শব্দ হইতে সাবধান থাকিবে। কেননা আল্লাহর দরবার হইতে কবুলিয়াত তাহার বদদোয়াকে অভ্যর্থনা জানাইবার জন্য আগাইয়া আসে।

ঐসব ছহীফায় আরও নসীহত ছিল—জ্ঞানী লোকদের জন্য নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ না পাওয়া পর্যন্ত সময়কে তিন অংশে ভাগ করিয়া লওয়া জরুরী। এক অংশে আপন রবের এবাদত-বন্দেগী করিবে এবং এক অংশে নফসের মুহাসাবা করিবে এবং চিন্তা করিবে যে, কয়টি কাজ ভাল করিয়াছে আর কয়টি মন্দ করিয়াছে। আর এক অংশ হালাল রুজি-রোজগারের জন্য ব্যয় করিবে।

জ্ঞানীর জন্য ইহাও জরুরী যে, সময়ের হেফাজত করিবে। নিজেও সংশোধনের ফিকিরে লাগিয়া থাকিবে। জবানকে অনর্থক কথাবার্তা হইতে হেফাজত করিবে। যে ব্যক্তি নিজের কথাবার্তার হিসাব লইতে থাকে তাহার জবান অনর্থক কথাবার্তায় কম চলে।

বুদ্ধিমান লোকের জন্য আরও জরুরী হইল, সে তিন জিনিস ব্যতীত সফর করিবে না। এক, আখেরাতের সম্বল সংগ্রহের জন্য। দুই, কিছুটা রুজি-রোজগারের জন্য। তিন, বৈধ উপায়ে আনন্দ উপভোগের জন্য।

হযরত আবূ যর (রাযিঃ) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! হযরত মূসা (আঃ)এর ছহীফাসমূহে কি ছিল? তিনি এরশাদ করিলেন, সবই উপদেশ ও নসীহতের কথা ছিল। যেমন, আমি আশ্চর্যবোধ করি ঐ ব্যক্তির উপর, যে মৃত্যুকে সুনিশ্চিত জানিয়াও কেমন করিয়া কোন বিষয়ের উপর আনন্দিত হয়। (কেননা, কাহারও ফাঁসি সুনিশ্চিত হইলে সে কিছুতেই আনন্দিত হইতে পারে না।) আমি আশ্চর্যবোধ করি ঐ ব্যক্তির উপর, যাহার মৃত্যুর একীন আছে অথচ সে হাসে। আমি আশ্চর্যবোধ করি ঐ ব্যক্তির উপর, যে সবসময় দুনিয়ার দুর্ঘটনা ও উত্থান-পতন দেখিতেছে তারপরও দুনিয়ার প্রতি আস্থাশীল হইয়া থাকে। আমি আশ্চর্যবোধ করি ঐ ব্যক্তির উপর, যাহার তকদীরের উপর একীন আছে তবুও দুঃখ-কষ্টে পেরেশান হইয়া পড়ে। আমি আশ্চর্যবোধ করি ঐ ব্যক্তির উপর, যাহার অতি শীঘ্রই হিসাব দেওয়ার একীন আছে। তবুও নেক আমল করে না। হযরত আবূ যর (রাযিঃ)

বলেন, আমি আরজ করিলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে কিছু ওসিয়ত করুন। তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম তাকওয়ার ওসিয়ত করিলেন এবং বলিলেন, ইহা হইল সমস্ত কিছুর বুনিয়াদ ও মূল। আমি আরজ করিলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! আরও কিছু ওসিয়ত করুন। এরশাদ করিলেন, কুরআন তেলাওয়াত ও যিকিরের এহ্‌তেমাম কর। এইগুলি দুনিয়াতে তোমার জন্য নূর এবং আসমানে সঞ্চিত ভাণ্ডার স্বরূপ। হযরত আবূ যর (রাযিঃ) বলেন, আমি আরও কিছু ওসিয়তের জন্য আরজ করিলে তিনি এরশাদ করিলেন, অধিক হাসি হইতে বিরত থাক। কেননা উহাতে দিল মরিয়া যায় এবং চেহারার সৌন্দর্য চলিয়া যায়। (অর্থাৎ জাহের ও বাতেন উভয়টার জন্যই ক্ষতিকর হয়।) আমি আরও কিছু ওসিয়তের দরখাস্ত করিলে তিনি এরশাদ করিলেন, জেহাদের এহ্‌তেমাম কর। কেননা ইহাই আমার উম্মতের বৈরাগ্য-সাধনা। (পূর্ববর্তী উম্মতের ঐ সকল লোকদেরকে রাহেব বা সংসার বিরাগী বলা হইত, যাহারা দুনিয়ার যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া শুধুমাত্র আল্লাহর এবাদতে মশগুল হইয়া থাকিত।) হযরত আবূ যর (রাযিঃ) বলেন, আমি আরও কিছু চাহিলে তিনি এরশাদ করিলেন, গরীব মিসকীনদের সহিত সম্পর্ক রাখ, তাহাদেরকে বন্ধু বানাইয়া লও, তাহাদের পাশে বস। আমি আরও কিছু চাহিলে তিনি এরশাদ করিলেন, তোমার চেয়ে নিম্নস্তরের লোকদেরকে দেখ (ইহাতে শোকরের অভ্যাস গড়িয়া উঠিবে)। আর তোমার চেয়ে উপরের স্তরের লোকদেরকে দেখিও না, কারণ ইহাতে তোমাকে দেওয়া আল্লাহর নেয়ামতসমূহকে তুচ্ছ ভাবিয়া বসিতে পার। আমি আরও কিছু নসীহত চাহিলে হুযূর এরশাদ করিলেন, তোমার নিজের দোষ যেন তোমাকে অপরের দোষ দেখা হইতে বিরত রাখে, মানুষের দোষ জানিবার চেষ্টা করিও না, কেননা তুমি নিজেই উহাতে লিপ্ত রহিয়াছ। তোমার দোষের জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, তুমি মানুষের মধ্যে এমন দোষ তালাশ কর যাহা স্বয়ং তোমার মধ্যে রহিয়াছে অথচ তুমি উহা হইতে বে-খবর, আর তুমি তাহাদের এমন বিষয়ে দোষ ধর যাহা তুমি নিজেই করিয়া থাক। অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন স্নেহের হাত আমার বুকের উপর মারিয়া এরশাদ করিলেন, হে আবূ যর! ভাবিয়া কাজ করার মত বুদ্ধিমত্তা নাই, নাজায়েয কাজ হইতে বাঁচিয়া থাকার মত পরহেজগারী নাই এবং চরিত্রবান হওয়া অপেক্ষা ভদ্রতা নাই।

এখানে সংক্ষিপ্তসার ও মূল উদ্দেশ্যের প্রতি অধিক লক্ষ্য রাখা হইয়াছে, শাব্দিক তরজমার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় নাই।

(২২) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِىْ بَيْتٍ مِّنْ بُيُوْتِ اللّٰهِ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللّٰهِ وَيَتَدَارَسُوْنَهٗ بَيْنَهُمْ اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِيْمَنْ عِنْدَهٗ.

(رواه مسلم وابوداؤد)

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں مجتمع ہو کر تلاوت کلام پاک اور اس کا دور نہیں کرتی مگر اُن پر سکینہ نازل ہوتی ہے اور رحمت اُن کو ڈھانپ لیتی ہے۔ ملائکہ رحمت اُن کو گھیر لیتے ہیں اور حق تعالیٰ شانہ ان کا ذکر ملائکہ کی مجلس میں فرماتے ہیں

(২২) হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ নকল করিয়াছেন যে, যখন কোন জামাত আল্লাহর কোন ঘরে একত্রিত হইয়া কুরআন পাকের তেলাওয়াত ও দাওর করে তখন তাহাদের উপর ছাকীনা নাযিল হয়, আল্লাহর রহমত তাহাদেরকে ঢাকিয়া লয়, রহমতের ফেরেশতাগণ তাহাদেরকে বেষ্টন করিয়া লয় এবং আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের মজলিসে তাহাদের আলোচনা করেন।

(মুসলিম, আবূ দাউদ)

এই হাদীসে মক্তব ও মাদরাসার বিশেষ ফযীলত বর্ণনা করা হইয়াছে। যাহাতে বহু প্রকার সম্মান ও ইজ্জতের বিষয় রহিয়াছে। প্রত্যেকটি সম্মান এইরূপ যে, যদি কোন ব্যক্তি উহার একটিও হাসিল করিবার জন্য সারা জীবন ব্যয় করিয়া দেয় তবুও উহা অত্যন্ত সস্তার সওদা হইবে। অথচ এখানে অনেকগুলি নেয়ামতের কথা বলা হইয়াছে। বিশেষতঃ মাহবূবের মজলিসে তাহার আলোচনা হওয়ার এই শেষোক্ত নেয়ামতটি এমন, যাহার সমতুল্য আর কিছুই হইতে পারে না।

ছাকীনা নাযিল হওয়ার বিষয়টি বিভিন্ন রেওয়ায়াতে আসিয়াছে। তবে ছাকীনার ব্যাখ্যায় হাদীসের মাশায়েখদের কয়েকটি অভিমত রহিয়াছে এবং এইগুলি পরস্পর বিপরীত নয় বরং সবগুলির সমষ্টিও ছাকীনার ব্যাখ্যা হইতে পারে। হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন, উহা একটি বিশেষ বাতাস যাহার চেহারা মানুষের চেহারার মত হইয়া থাকে। আল্লামা সুদ্দী (রহঃ) বলেন, ছাকীনা স্বর্ণের তৈরী জান্নাতের একটি তশতরীর নাম। উহাতে আম্বিয়ায়ে কেরামের কলবসমূহকে গোসল করানো হয়। কেহ কেহ বলিয়াছেন, উহা একটি খাছ রহমত। আল্লামা তাবারী (রহঃ) এই অর্থকে

পছন্দ করিয়াছেন, কেননা ‘ছাকীনা’ দ্বারা কলবের স্থিরতা ও শান্তিই উদ্দেশ্য। কেহ কেহ বলিয়াছেন, ছাকীনা দ্বারা অন্তরের প্রশান্তি উদ্দেশ্য। আবার কেহ কেহ উহার অর্থ করিয়াছেন গাম্ভীর্য। কেহ কেহ ব্যাখ্যা করিয়াছেন ছাকীনা দ্বারা ফেরেশতা উদ্দেশ্য। এইরূপ আরও বহু ব্যাখ্যা রহিয়াছে। ‘ফাতহুল বারী’ নামক কিতাবে হাফেজ ইবনে হজর (রহঃ) বলেন, এই সবগুলি কথাই ছাকীনার ব্যাখ্যা হইতে পারে। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, ছাকীনা এমন এক জিনিস যাহা শান্তি রহমত ইত্যাদি বিষয়ের সমষ্টি। উহা ফেরেশতাদের সহিত নাযিল হয়। কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে ছাকীনা শব্দটি আসিয়াছে। যেমন—فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلَيْهِ (সূরা তওবাহ, আয়াত ঃ ৪০)

আরেক আয়াতে এরশাদ হইয়াছে—

هُوَ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِىْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ (সূরা ফাত্‌হ, আয়াত ঃ ৪)

আরেক আয়াতে এরশাদ হইয়াছে— فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ

(সূরা বাকারা, আয়াত ঃ ২৪৮)

মোটকথা, বিভিন্ন আয়াত ও হাদীসে ইহার সুসংবাদ দান করা হইয়াছে। ‘এহ্ইয়া উল উলূম’ কিতাবে নকল করা হইয়াছে যে, ইবনে ছাওবান (রহঃ) এক বন্ধুর সহিত ইফতারের ওয়াদা করিলেন। কিন্তু সেখানে তিনি পরদিন সকালে উপস্থিত হইলেন। বন্ধু অভিযোগ করিলে তিনি বলিলেন, তোমার সহিত যদি আমার ওয়াদা না থাকিত তবে আমার অসুবিধার কারণটি তোমাকে কিছুতেই বলিতাম না। ব্যাপার হইল, কোন কারণবশতঃ আমার আসলেই দেরী হইয়া গিয়াছিল, এমনকি এশার ওয়াক্ত হইয়া গেল। খেয়াল হইল যে, বেতের নামাযটিও আদায় করিয়া লই, কারণ মৃত্যুর কথা বলা যায় না, হয়ত রাত্রেই মরিয়া যাইব আর বেতের নামাযটি আমার জিম্মায় থাকিয়া যাইবে। দোয়ায়ে কুনূত পড়িতেছিলাম হঠাৎ জান্নাতের একটি সবুজ বাগান আমার নজরে পড়িল। উহাতে সব ধরণের ফল-ফুল ছিল। উহা দেখিতে দেখিতে আমি এমন বিভোর হইয়া পড়ি যে, সকাল হইয়া গেল। বুযুর্গানে দ্বীনের জীবনীতে এইরূপ শত শত ঘটনা বর্ণিত আছে। কিন্তু উহার প্রকাশ তখনই ঘটে যখন আল্লাহ ব্যতীত সব কিছু হইতে সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া একমাত্র আল্লাহর দিকেই তাওয়াজ্জুহ নিবদ্ধ করা হয়।

ফেরেশতাদের বেষ্টন করার কথাও বহু হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে। হযরত উসাইদ ইবনে হুযাইর-(রাযিঃ)এর একটি ঘটনা হাদীসের কিতাবে

বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। একবার তেলাওয়াত করার সময় মাথার উপর মেঘের মত কি যেন অনুভব করিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনিয়া বলিলেন, উহারা ফেরেশতা ছিল। কুরআন শরীফ শুনিবার জন্য আসিয়াছিল। ফেরেশতাদের ভীড়ের কারণে মেঘের মত মনে হইতেছিল। অপর এক সাহাবীও একবার মেঘের মত অনুভব করিয়াছিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, উহা ছাকীনা ছিল। অর্থাৎ রহমত ছিল যাহা কুরআন তেলাওয়াতের কারণে নাযিল হইয়াছিল। মুসলিম শরীফে এই হাদীস আরও বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। হাদীসের শেষাংশে এই বাক্যটিও আসিয়াছে—

مَنْ بَطَّاَبِهٖ عَمَلُهٗ لَمْ يُسْرِعْ بِهٖ نَسَبُهٗ.

অর্থাৎ যে ব্যক্তিকে তাহার বদ আমল আল্লাহর রহমত হইতে দূরে লইয়া যায় তাহার বংশমর্যাদা তাহাকে রহমতের নিকটবর্তী করিতে পারে না।

একজন বংশানুক্রমে উচ্চ বংশীয় লোক যে আল্লাহর নাফরমানীতে লিপ্ত, সে কোনভাবেই আল্লাহর নিকট ঐ নীচ বংশীয় মুসলমানের সমকক্ষ হইতে পারিবে না যে মুত্তাকী ও পরহেজগার। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিয়াছেন—

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ.

অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই অধিক সম্মানিত যে বেশী মুত্তাকী। (সূরা হুজুরাত, আয়াত ঃ ১৩)

(٢٣) عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّكُمْ لَا تَرْجِعُوْنَ اِلَى اللّٰهِ بِشَيْءٍ اَفْضَلَ مِمَّا خَرَجَ مِنْهُ يَعْنِى الْقُرْاٰنَ.

(رواه الحاكم وصححه ابوداؤد فى مراسيله عن جبير بن نفير و الترمذى عن ابى امامة بمعناه)

ابوذرؓ حضور اقدس صلى الله عليه وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ تم لوگ اللہ جل شانہ کی طرف رجوع اور اس کے یہاں تقرب اس چیز سے بڑھ کر کسی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتے جو خود حق سبحانہ سے نکلی ہے یعنی کلام پاک۔

(২৩) হযরত আবূ যর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত ঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা আল্লাহ তায়ালার প্রতি রুজু ও তাঁহার দরবারে নৈকট্য ঐ জিনিস হইতে অধিক আর কোন জিনিস

দ্বারা হাসিল করিতে পারিবে না, যাহা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা হইতে বাহির হইয়াছে অর্থাৎ কালামে পাক। (হাকিম, আবূ দাউদ ঃ মারাসীল, তিরমিযী)

বিভিন্ন রেওয়ায়াত দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তায়ালার দরবারে নৈকট্য হাসিল করার জন্য কালামে পাকের চেয়ে বড় কোন বস্তু নাই। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) বলেন, আমি আল্লাহ তায়ালাকে স্বপ্নে জিয়ারত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বস্তু যাহা দ্বারা আপনার দরবারে নৈকট্য লাভ করা যায় উহা কি? এরশাদ হইল—আহমদ! আমার কালাম। আমি আরজ করিলাম, বুঝিয়া পড়িলে নাকি না বুঝিয়া পড়িলেও। এরশাদ হইল, বুঝিয়া পড়ুক বা না বুঝিয়া পড়ুক, উভয় অবস্থায় নৈকট্য হাসিল হইবে।

এই হাদীসের ব্যাখ্যা এবং কালামে পাকের তেলাওয়াত নৈকট্য লাভের সর্বোত্তম পন্থা হওয়ার বিশদ বর্ণনা শাহ আব্দুল আযীয (রহঃ)এর তফসীর হইতে পাওয়া যায়। উহার সারকথা হইল, সুলূক ইলাল্লাহ অর্থাৎ মর্তবায়ে এহ্ছান যাহা সর্বদা আল্লাহ তায়ালার ধ্যান অন্তরে উপস্থিত থাকার নাম। উহা তিন তরীকায় হাসিল হইতে পারে। প্রথমতঃ তাছাওউর, শরীঅতের পরিভাষায় যাহাকে 'তাফাক্কুর' ও 'তাদাব্বুর' অর্থাৎ চিন্তা ফিকির বলে এবং সুফিয়ায়ে কেরাম যাহাকে মুরাকাবা বলেন। দ্বিতীয়তঃ জবানী যিকির। তৃতীয়তঃ কালামে পাক তেলাওয়াত করা। সর্বপ্রথম তরীকা যেহেতু কলবী যিকিরেরই অন্তর্ভুক্ত সুতরাং তরীকা মাত্র দুইটিই বাকী রহিল। এক, যিকির, জবানী হউক বা কলবী। দুই, কুরআন তেলাওয়াত। সুতরাং যে শব্দকে আল্লাহ তায়ালার স্মরণের জন্য ব্যবহার করা হইবে এবং উহাকে বারবার উচ্চারণ করা হইবে—যাহা যিকিরের সারমর্ম, উহার দ্বারা মেধাশক্তি আল্লাহর যাতের প্রতি মনোযোগী ও আকৃষ্ট হইবে। যেন সেই মহান সত্তা সর্বক্ষণ অন্তরে বিরাজ করিবে, আর এই সার্বক্ষণিক অন্তরে বিরাজ থাকার নাম হইল সঙ্গলাভ যাহাকে হাদীস শরীফে এইভাবে বলা হইয়াছে—

لَا يَزَالُ عَبْدِىْ يَتَقَرَّبُ اِلَىَّ بِالنَّوَافِلِ حَتّٰى اَحْبَبْتُهٗ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِىْ يَسْمَعُ بِهٖ وَبَصَرَهُ الَّذِىْ يُبْصِرُ بِهٖ وَيَدَهُ الَّتِىْ يَبْطِشُ بِهَا الحديث

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিয়াছেন, বান্দা নফল এবাদতের দ্বারা আমার নৈকট্য হাসিল করিতে থাকে। আমিও তাহাকে প্রিয় বানাইয়া লই। এমনকি আমি তাহার কান হইয়া যাই যাহা দ্বারা সে শুনে, তাহার চক্ষু হইয়া যাই যাহা দ্বারা সে দেখে, তাহার হাত হইয়া যাই যাহা দ্বারা সে

কোন বস্তুকে ধরে এবং তাহার পা হইয়া যাই যাহা দ্বারা সে চলে। অর্থাৎ বান্দা অধিক এবাদতের দ্বারা যখন আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভ করে, তখন আল্লাহ তায়ালা তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের হিফাজতকারী হইয়া যান। তাহার চোখ কান সবকিছু মনিবের ইচ্ছার অনুগত হইয়া যায়। অধিক পরিমাণে নফল এবাদতের কথা এই জন্য বলা হইয়াছে যে, ফরজ এবাদত নির্ধারিত রহিয়াছে। উহার মধ্যে বেশী করা যায় না। আর এই অবস্থার জন্য অন্তরে সার্বক্ষণিক আল্লাহ তায়ালার উপস্থিতির ধ্যান একান্ত জরুরী। নৈকট্য লাভের এই তরীকা একমাত্র আল্লাহর জন্যই খাছ। যদি কেহ চায় যে, অন্য কাহারও নামের তসবীহ পড়িয়া তাহার নৈকট্য হাসিল করিয়া নিবে, তবে ইহা কখনও সম্ভব হইবে না। কারণ যাহার নৈকট্য হাসিল করা হইবে তাহার মধ্যে দুইটি গুণ থাকা খুবই জরুরী। এক, যিকিরকারী বিভিন্ন সময়ে জবানী বা কল্‌বী যে কোন পন্থায় তাহাকে ডাকে উহার সর্বময় এলেম তাহার থাকিতে হইবে। দুই, যিকিরকারীর মেধাশক্তির মধ্যে নূর দান করা ও উহা পরিপূর্ণ করিয়া দেওয়ার ক্ষমতা থাকিতে হইবে। তাসাউফের পরিভাষায় উহাকে 'দুনু ও তাদাল্লী' এবং 'নুযূল ও কুরব' বলা হয়।

এই দুইটি বিষয়ই একমাত্র আল্লাহ তায়ালার মধ্যেই পাওয়া যায়, তাই উপরোক্ত তরীকার দ্বারা একমাত্র তাহারই নৈকট্য হাসিল হইতে পারে। হাদীসে কুদসীতেও এই দিকেই ইশারা করা হইয়াছে—

مَنْ تَقَرَّبَ اِلَىَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ ذِرَاعًا

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার দিকে এক বিঘত পরিমাণ নিকটবর্তী হয়, আমি তাহার দিকে এক হাত নিকটবর্তী হই, আর যে আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয়, আমি তাহার দিকে প্রসারিত দুই হাত পরিমাণ অগ্রসর হই, আর যে আমার দিকে সাধারণভাবে হাটিয়া আসে আমি তাহার দিকে দৌড়াইয়া যাই।

হাদীসে এইসব উপমা শুধু বুঝাইবার জন্য, নচেৎ আল্লাহ তায়ালা চলাফেরা ইত্যাদি সকল মানবীয় বিষয় হইতে পবিত্র। আসল মকসুদ হইল আল্লাহ তায়ালাকে পাইবার জন্য যে চেষ্টা করে তাহার চেষ্টার চেয়ে বেশী আল্লাহ তায়ালা তাওয়াজ্জুহ দেন ও অগ্রসর হন। আর অসীম দয়ালুর জন্য ইহাই স্বাভাবিক। অতএব যাহারা সর্বদা স্থায়ীভাবে তাহাকে স্মরণ করে, মহান মনিবের পক্ষ হইতে তাওয়াজ্জুহও তাহাদের প্রতি স্থায়ী হয়। কালামে পাক যেহেতু সম্পূর্ণই যিকির, উহার একটি আয়াতও যিকির ও

আল্লাহর প্রতি মনোযোগ হইতে খালি নয়, কাজেই কালামে পাকের দ্বারাও নৈকট্য লাভ হয়। বরং উহার মধ্যে একটি অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে যাহা অধিক নৈকট্য লাভের একটি মাধ্যম। তাহা এই যে, প্রত্যেক কথা নিজের মধ্যে বক্তার গুণাবলী ও প্রভাব ধারণ করিয়া থাকে। ইহা একটি সুস্পষ্ট কথা যে, ফাসেক–ফাজেরের কবিতা পড়িলেও অন্তরে উহার প্রভাব পড়ে এবং বুযুর্গানে দ্বীনের কবিতা পড়িলে অন্তরে উহার ফল প্রকাশিত হয়। এই কারণেই যুক্তিবিদ্যা ও দর্শন শাস্ত্র অতিমাত্রায় চর্চা করিলে গর্ব ও অহঙ্কার পয়দা হয়। হাদীসের সহিত অধিক সম্পর্ক রাখার দ্বারা বিনয় পয়দা হয়। এই কারণেই ফারসী ও ইংরেজী ভাষা হিসাবে সমান হইলেও উক্ত ভাষাদ্বয়ে যে সকল লেখকের বইপুস্তক পড়ানো হয় তাহাদের মনোভাবের ভিন্নতার দরুন প্রতিক্রিয়াও ভিন্ন ভিন্ন হয়।

মোটকথা, কালামের মধ্যে সর্বদাই বক্তার প্রভাব ও আছর বিদ্যমান থাকে। কাজেই আল্লাহর কালাম বারবার পাঠ করার দ্বারা অন্তরে আল্লাহর প্রভাব পয়দা হওয়া এবং আল্লাহর সহিত স্বভাবগত সম্পর্ক সৃষ্টি হওয়া নিশ্চিত বিষয়। ইহা ছাড়া প্রত্যেক লেখকের নিয়ম হইল, কেহ তাহার লিখিত কিতাব গুরুত্বসহকারে পাঠ করিলে স্বভাবগতভাবেই তাহার প্রতি লেখকের বিশেষ মনোযোগ ও দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়া থাকে। অতএব সর্বদা আল্লাহ তায়ালার কালামে পাক তেলাওয়াতকারীর প্রতি আল্লাহর তাওয়াজ্জুহ অধিক হইবে ইহা নিতান্ত স্বাভাবিক ও একীনী কথা। এই অধিক তাওয়াজ্জুহই অধিক নৈকট্য হাসিলের কারণ হয়। মেহেরবান আল্লাহ তায়ালা আপন দয়া ও রহমতে আমাকে এবং তোমাদেরকে এই অনুগ্রহ দ্বারা সম্মানিত করুন।

(٢٤) عَنْ اَنَسٍؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ لِلّٰهِ اَهْلِيْنَ مِنَ النَّاسِ قَالُوْا مَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَهْلُ الْقُرْاٰنِ هُمْ اَهْلُ اللّٰهِ وَخَاصَّتُهٗ (رواه النسائی و ابن ماجة و الحاکم و احمد)

انسؓ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ حق تعالیٰ شانہٗ کے لئے لوگوں میں سے بعض لوگ خاص گھر کے لوگ ہیں صحابہؓ نے عرض کیا کہ وہ کون لوگ ہیں فرمایا کہ قرآن شریف والے کہ وہ اللہ کے اہل ہیں اور خواص۔

(২৪) হযরত আনাস (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ নকল করিয়াছেন যে, লোকদের মধ্য হইতে কিছু লোক আল্লাহ তায়ালার ঘরোয়া খাছ লোক। সাহাবীগণ আরজ করিলেন, ইয়া

রাসূলাল্লাহ! তাহারা কোন্ লোক? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, তাহারা হইল, কুরআন শরীফ ওয়ালা। তাহারাই আল্লাহ তায়ালার আপন ও খাছ লোক। (নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, আহমদ, হাকিম)

'কুরআনওয়ালা' ঐ সমস্ত লোক, যাহারা সর্বদা কালামে পাকে মশগুল থাকে এবং উহার সহিত বিশেষ সম্পর্ক রাখে। তাহাদের আল্লাহ তায়ালার আপন ও খাছ লোক হওয়া খুবই স্পষ্ট ব্যাপার। পূর্বের আলোচনা দ্বারাও এই কথা স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, তাহারা যখন সর্বদা আল্লাহর কালামে মশগুল থাকে তখন আল্লাহর মেহেরবানীও সর্বদা তাহাদের প্রতি হইয়া থাকে। যাহারা সর্বদা কাছে অবস্থান করে তাহারাই আপন ও খাছ লোক হইয়া থাকে। কত বড় ফযীলতের কথা! সামান্য মেহনত ও চেষ্টার দ্বারা আল্লাহওয়ালা হওয়া যায়, আল্লাহ তায়ালার আপন ও খাছ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার মর্যাদা হাসিল করা যায়।

দুনিয়ার কোন দরবারে প্রবেশের অনুমতি পাওয়ার জন্য বা একটি মেম্বরী পদের জন্য মানুষ কত জান মাল বিসর্জন দিয়া থাকে। ভোটারদের দুয়ারে দুয়ারে তোশামোদ করিতে হয়, লাঞ্ছনা ও অপমান সহ্য করিতে হয় এবং এইগুলিকে কাজ মনে করা হয়। কিন্তু কুরআনের জন্য মেহনত করাকে বেকার মনে করা হয়।

ببیں تفاوتِ رہ از کجاست تا بہ کجا

দেখ উভয় রাস্তার মধ্যে কত আকাশ পাতাল ব্যবধান।

(٢٥) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَذِنَ اللّٰهُ لِشَيْءٍ مَا اَذِنَ لِنَبِيٍّ يَتَغَنّٰى بِالْقُرْاٰنِ (رواه البخاری و مسلم)

ابوہریرہؓ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ حق سبحانہٗ اتنا کسی کی طرف توجہ نہیں فرماتے جتنا کہ اس نبی کی آواز کو توجہ سے سنتے ہیں، جو کلام الٰہی خوش الحانی سے پڑھتا ہو۔

(২৫) হযরত আবূ হুরাইরা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা কাহারও প্রতি এত মনোযোগ দেন না যত মনোযোগের সহিত ঐ নবীর আওয়াজকে শুনেন যিনি সুমিষ্ট স্বরে আল্লাহর কালাম পাঠ করেন। (বুখারী, মুসলিম)

পূর্বেই জানা গিয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁহার কালাম তেলাওয়াতকারীর প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ দিয়া থাকেন। আম্বিয়ায়ে

কেরাম যেহেতু তেলাওয়াতের আদব পুরাপুরিভাবে আদায় করিয়া থাকেন, কাজেই তাহাদের প্রতি মনোযোগ বেশী হওয়াটাই স্বাভাবিক। তদুপরি উহার সহিত যখন মধুর সুর মিলিত হয়, তবে তো সোনায় সোহাগা। এমতাবস্থায় আল্লাহ তায়ালার মনোযোগ দান বেশীই হইবে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। নবীগণের পর যে যতটুকু হক আদায় করিয়া পড়ে পর্যায়ক্রমে তাহার প্রতি ততটুকু মনোযোগ দেওয়া হয়।

(٢٦) عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُ اَشَدُّ اُذُنًا اِلٰى قَارِئِ الْقُرْاٰنِ مِنْ صَاحِبِ الْقَيْنَةِ اِلٰى قَيْنَتِهٖ۔

فضالہ ابن عبیدؓ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ حق تعالیٰ شانہٗ قاری کی آواز کی طرف اس شخص سے زیادہ کان لگاتے ہیں جو اپنی گانے والی باندی کا گانا سن رہا ہو۔

(رواہ ابن ماجۃ و ابن حبان والحاکم کذا فی شرح الاحیاء قلت وقال الحاکم صحیح علی شرطہما وقال الذہبی منقطع)

(২৬) হযরত ফাযালা ইবনে উবাইদ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা কুরআন তেলাওয়াতকারীর আওয়াজ ঐ ব্যক্তির চেয়ে অধিক মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেন যে আপন গায়িকা বাঁদীর গান কান লাগাইয়া শ্রবণ করিতেছে। (শরহে এহ্ইয়া ঃ ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, হাকিম)

স্বভাবতঃই গানের আওয়াজের প্রতি মন আকৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু শরীয়তের বাধার কারণে দ্বীনদার লোক সেই দিকে মনোযোগী হয় না। অবশ্য গায়িকা যদি নিজের বাঁদী হয় তবে তাহার গান শুনিতে শরীয়তের দৃষ্টিতে কোন ক্ষতি নাই। এইজন্য তাহার গানের প্রতি পূর্ণ মনোযোগ হইয়া থাকে। কিন্তু কালামে পাকের বেলায় ইহা অত্যন্ত জরুরী যে, উহা যেন গানের সুরে পড়া না হয়। কেননা হাদীসে উহার নিষেধ আসিয়াছে। এক হাদীসে আছে— (اَلْحَدِيْث) اِيَّاكُمْ وَلُحُوْنَ اَهْلِ الْعِشْقِ অর্থাৎ, প্রেমিকগণ যেভাবে সুর তুলিয়া সঙ্গীতের নিয়মে গান গায়, তোমরা সেইভাবে কুরআন পড়িও না। মাশায়েখগণ লিখিয়াছেন, এইভাবে যাহারা পড়িবে তাহারা ফাসেক আর যাহারা শ্রবণ করিবে তাহারা গোনাহগার হইবে। তবে সঙ্গীতের নিয়ম-কানূন ব্যতীত সুমিষ্ট সুরে পড়াই এখানে উদ্দেশ্য। কারণ বিভিন্ন হাদীসে এইরূপে পড়ার জন্য উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে।

এক হাদীসে আছে, তোমরা সুমিষ্ট আওয়াজের দ্বারা কুরআনকে সৌন্দর্যমণ্ডিত কর। আরেক হাদীসে আছে, সুমিষ্ট আওয়াজের দ্বারা কুরআনের সৌন্দর্য দ্বিগুণ হইয়া যায়। শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) 'গুনিয়াতুত্তালেবীন' কিতাবে বলেন যে, একবার হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) কূফার শহরতলী দিয়া যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে এক বাড়ীতে কতকগুলি ফাসেক লোকের সমাবেশ ছিল ; যেখানে যাযান নামক জনৈক গায়ক সারিন্দা বাজাইয়া গান গাহিতেছিল। হযরত ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) তাহার আওয়াজ শুনিয়া বলিলেন, কত মধুর কন্ঠস্বর ! যদি উহা কুরআন তেলাওয়াতে ব্যবহার হইত ! এই কথা বলিয়া তিনি কাপড় দ্বারা মাথা ঢাকিয়া চলিয়া গেলেন। যাযান তাঁহার এই কথা শুনিয়া লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিল যে, তিনি সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) এবং তিনি এইরূপ বলিয়া গিয়াছেন। সাহাবীর বাক্যে তাহার অন্তরে এমন ভয়ের উদ্রেক হইল যে, কোন সীমা রহিল না। সে তাহার সমস্ত বাদ্যযন্ত্র ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের সঙ্গী হইয়া গেল। পরে একজন যুগশ্রেষ্ঠ আলেম হিসাবে খ্যাতি লাভ করিল।

মোটকথা, বিভিন্ন রেওয়ায়াতে মিষ্ট আওয়াজে তেলাওয়াতের প্রশংসা আসিয়াছে। কিন্তু সাথে সাথে গানের সুরে পড়ার ব্যাপারে নিষেধও আসিয়াছে। যেমন উপরে বর্ণিত হইয়াছে। হযরত হুযাইফা (রাযিঃ) বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আরবী লাহানে কুরআন শরীফ পড়, প্রেমিকের সুরে বা ইয়াহুদ নাসারাদের আওয়াজে পড়িও না। অতি শীঘ্র এমন এক দল আসিবে যাহারা গায়ক ও বিলাপকারীদের মত টানিয়া টানিয়া কুরআন পড়িবে। এই তেলাওয়াত তাহাদের কোনই উপকারে আসিবে না। বরং তাহারা নিজেরা ফেৎনায় পড়িবে এবং এই পড়া যাহাদের ভাল লাগিবে তাহাদেরকেও ফেৎনায় ফেলিয়া দিবে।

হযরত তাউস (রহঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিল যে, মিষ্ট সুরে তেলাওয়াতকারী কে? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যাহার তেলাওয়াত শুনিলে তুমি তাহার অন্তরে আল্লাহর ভয় অনুভব কর। অর্থাৎ তাহার আওয়াজ হইতে তাহার ভীত হওয়া বুঝা যায়। এই সবকিছুর পর আল্লাহ তায়ালার বড় দয়া ও অনুগ্রহ এই যে, মানুষ শুধু তাহার সামর্থ্য ও ক্ষমতা অনুযায়ী চেষ্টা করার জিম্মাদার।

হাদীসে আছে, 'যাহারা কুরআন পড়ে কিন্তু পুরাপুরি শুদ্ধভাবে পড়িতে পারে না, তাহাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ হইতে ফেরেশতা নিযুক্ত আছে যাহারা তাহাদের তেলাওয়াতকে সহী–শুদ্ধ করিয়া উপরে (আল্লাহর দরবারে) লইয়া যায়।' হে আল্লাহ ! আপনার প্রশংসার কোন শেষ নাই।

(٢٧) عَنْ عُبَيْدَةَ الْمُلَيْكِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَهْلَ الْقُرْاٰنِ لَاتَتَوَسَّدُوا الْقُرْاٰنَ وَاتْلُوْهُ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ مِنْ اٰنَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَاَفْشُوْهُ وَتَغَنَّوْهُ وَتَدَبَّرُوْا مَافِيْهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ وَلَاتَعْجَلُوْا ثَوَابَهٗ فَاِنَّ لَهٗ ثَوَابًا (رواه البيهقي فی شعب الايمان)

عُبیدہ مُلیکیؓ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے قرآن والو قرآن شریف سے تکیہ نہ لگاؤ اور اس کی تلاوت شب و روز ایسی کرو جیسا کہ اس کا حق ہے کلام پاک کی اشاعت کرو اور اس کو اچھی آواز سے پڑھو اور اس کے معانی میں تدبر کرو تاکہ تم فلاح کو پہنچو اور اس کا بدلہ (دنیا میں) طلب نہ کرو کہ (آخرت میں) اس کے لئے بڑا اجر و بدلہ ہے۔

(২৭) হযরত উবাইদা মুলাইকী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত ঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, হে কুরআন ওয়ালাগণ ! তোমরা কুরআন শরীফের সহিত টেক লাগাইও না। রাত্র দিন কুরআনের হক আদায় করিয়া তেলাওয়াত কর। কুরআন পাকের প্রচার–প্রসার কর এবং উহাকে মধুর সুরে তেলাওয়াত কর। উহার অর্থের মধ্যে চিন্তা–ফিকির কর, যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার। দুনিয়াতে উহার বদলা চাহিও না, আখেরাতে উহার জন্য বড় বদলা ও প্রতিদান রহিয়াছে।

(বায়হাকী ঃ শুআবুল–ঈমান)

এই হাদীসে কয়েকটি হুকুম রহিয়াছে—

(১) কুরআন শরীফের উপর টেক লাগাইও না। ইহার দুইটি অর্থ। এক, উহার উপর হেলান দিও না, কেননা ইহা আদবের খেলাফ। ইবনে হজর (রহঃ) লিখিয়াছেন, কুরআন পাকের উপর হেলান দেওয়া, উহার দিকে পা মেলাইয়া বসা, উহার দিকে পিঠ দিয়া বসা, উহাকে পদদলিত করা ইত্যাদি হারাম। দুই, কুরআনের উপর হেলান দিয়া না বসার দ্বারা ইঙ্গিত হইল গাফলতি না করা। অর্থাৎ কালামে পাককে বরকতের জন্য শুধু তাকিয়ার উপর রাখিয়া দিও না। যেমন কোন কোন মাজারে দেখা গিয়াছে যে, কবরের শিয়রের দিকে রেহালে কুরআন শরীফ রাখিয়া দেওয়া হয়।

এইভাবে কুরআনের হক নষ্ট করা হয়। কুরআনের হক হইল তেলাওয়াত করা।

(২) উক্ত হাদীসে দ্বিতীয় হুকুম হইল, হক আদায় করিয়া তেলাওয়াত কর। অর্থাৎ আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বেশী বেশী করিয়া তেলাওয়াত করা। স্বয়ং কুরআনে এরশাদ হইয়াছে— اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ অর্থাৎ, আমি যাহাদেরকে কিতাব দান করিয়াছি তাহারা উহার হক আদায় করিয়া তেলাওয়াত করিয়া থাকে। (সূরা বাকারা, আয়াত ঃ ১২১) অর্থাৎ যে মর্যাদা ও ইজ্জত সহকারে বাদশার ফরমান পাঠ করা হয় এবং যে আনন্দ ও আগ্রহ নিয়া প্রিয়জনের পত্র পড়া হয় ঠিক সেইভাবেই পড়া উচিত।

(৩) তৃতীয় হুকুম কুরআন পাকের প্রচার–প্রসার কর। অর্থাৎ ওয়াজের দ্বারা, লেখনীর দ্বারা, উৎসাহ প্রদানের দ্বারা এবং বাস্তব আমলের দ্বারা যেভাবেই হউক, যে পরিমাণই হউক উহার প্রচার কর। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কালামে পাকের প্রচার–প্রসারের হুকুম করিতেছেন, আর আমাদের আধুনিক চিন্তাধারার লোকেরা উহার তেলাওয়াতকে নিরর্থক বলিয়া থাকে। অথচ ইসলাম ও নবীর মহব্বতের কথা আসিলে নিজেরা লম্বা চওড়া মহব্বতের দাবীও করিয়া থাকে।

ترسم نرسی بکعبہ اے اعرابی کیں رہ کہ تو می روی بترکستان است

অর্থাৎ, হে বেদুঈন ! আমার ভয় হইতেছে তুমি কা'বা শরীফে পৌছিতে পারিবে না। কারণ, তুমি যে পথে চলিয়াছ উহা তুর্কিস্তানের পথ।

মনিবের হুকুম হইল, তোমরা কুরআনের প্রচার কর আর আমাদের চেষ্টা হইল বাধা সৃষ্টির ব্যাপারে যেন কোন প্রকার ত্রুটি না করি— বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করিবা ; যেন বাচ্চারা কুরআন পাকের পরিবর্তে প্রাইমারীতে পড়ে। আমাদের ক্ষোভ হইল মকতবের মিয়াজী বাচ্চাদের জীবন নষ্ট করে, এই জন্য আমরা সেখানে পড়াইতে চাই না। স্বীকার করি নিঃসন্দেহে তাহারা ত্রুটি করে কিন্তু মনে রাখিবেন, তাহাদের ত্রুটির কারণে আপনি কি দায়মুক্ত হইয়া যাইতেছেন বা আপনার উপর হইতে কুরআন পাকের প্রচারের দায়িত্ব সরিয়া যাইতেছে? বরং এই অবস্থায় দায়িত্ব আপনার উপরই ফিরিয়া আসিতেছে। তাহারা তাহাদের ত্রুটির জবাবদেহী নিজেরাই করিবেন। কিন্তু তাহাদের ত্রুটির কারণে আপনি বাচ্চাদেরকে জোরপূর্বক কুরআনের মকতব হইতে সরাইয়া দিবেন এবং তাহাদের পিতামাতার উপর নোটিস জারী করাইবেন, যাহার ফলে